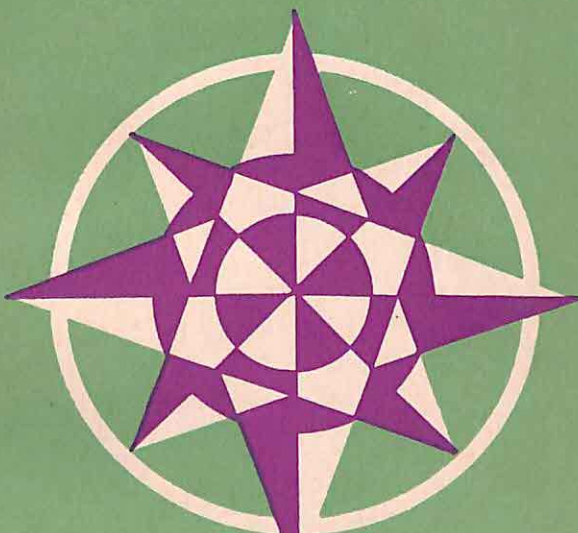
দেশ ও মানুষ

২

নীরেন সেন

ভূগোল

সপ্তম শ্রেণী



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অনুমোদিত পাঠক্রম অনুযায়ী
সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখিত।

দেশ ও মানুষ

নীরেন সেন, এম. এ.
অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা ; প্রাক্তন রিসার্চ
অফিসার, পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ার

কলকাতা
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ

DESH O MANUSH 2 (Bengali)
(The Land and the People)
Niren Sen

First published 1974
Second impression 1975

ছবি ও মানচিত্র : গোপাল চন্দ্র রায়। প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত
আলোকচিত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সৌজন্যে।

Printed in India by offset by J. N. Dey
at Union Press, 20A, Gour Laha Street, Calcutta 700006
Published by John Brown, Oxford University Press,
Faraday House, Calcutta 700013

ভূমিকা

ইতিপূর্বে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভূগোলের কোন বাংলা বই ছিল না বর্তমানে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় এই অভাব কিছুটা মিটবে। গত আট বছর পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটীয়ার রচনার কাজে নিযুক্ত থাকায় আমাকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় ব্যাপকভাবে ঘুরতে হয়েছে। এইভাবে আমি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতিকে শুধু পুঁথিগতভাবে নয় বরং সামনাসামনি দেখতে ও জানতে পেরেছি। বহুদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের যেসব ভৌগোলিক তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করেছি সেগুলি যাতে সবাইকার কাজে লাগে সে সুযোগের সন্ধানে ছিলাম। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী লেখার জন্য আমাকে সব বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করতে হয়েছে (কোন কোন অংশ বাদও দিতে হয়েছে)। বহু আলোকচিত্র ও মানচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে বইটিকে ছাত্রদের জন্য সহজপাঠ্য করেছি। চেষ্টা করেছি এমনভাবে তত্ত্বনির্ভর তথ্য দিতে যাতে ছাত্রদের জিজ্ঞাসু মন সহজে সন্তুষ্ট হয় এবং জ্ঞানপিপাসা আরও বাড়ে। বইটিতে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিকে ভিন্ন ভিন্নরূপে শুধু প্রশাসনিক দৃষ্টিতে দেখা হয়নি ; পাঠক্রম অনুযায়ী পরিবেশনির্ভর ভৌগোলিক অঞ্চলরূপে কয়েকটি জেলাকে একত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে সাধারণতঃ ভূগোল সম্পর্কে কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীর ভীতি আছে। ভূগোলকে তারা গোড়া থেকেই একটি নীরস বিষয় মনে করে। সেজন্য 'ভূগোলেও গোল' কথাটি ছাত্রসমাজে বহুল প্রচারিত। অবশ্য যে দেশে ভৌগোলিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দেশভাগ করে স্বাধীনতা পেতে হয় সেখানে এতদিন অন্য কিছু আশা করাই অন্যায় হত। দেশকে জানার আগ্রহ থাকলে ভূগোলের এই নতুন পাঠক্রমের ফল হবে সুদূরপ্রসারী। ভূগোল যদি সহজ ও সরলভাবে আলোচনা করা যায় তবে গল্পের বইএর থেকেও তা চিত্তাকর্ষক হয়। বইটি সেভাবেই লেখা হয়েছে।

অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতিটি ভৌগোলিক তথ্যের কার্যকারণ সম্পর্ক এমনভাবে উপস্থাপিত করেছি যাতে বইটি পড়ে তথাকথিত ভাল ও খারাপ সবরকম ছাত্র-ছাত্রীই উপকৃত হয়। সেজন্যই পরিশিষ্টে বিশেষ কয়েকটি বিষয়েরও আলোচনা করতে হল। উপরন্তু সাধারণ বিষয়গত প্রশ্ন ও উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নও দেওয়া হয়েছে।

এই বইখানি রচনার কাজে আমি আমার কলেজের সহকর্মীদের বিশেষতঃ প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষের কাছে ঋণী। যাঁরা পাঠক্রম রচনা করেছেন তাঁদের কেউ কেউ আমার সহকর্মী হওয়ায় পাঠক্রম বুঝতে আমার বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই যে বইখানি অভিনবত্বের দাবী রাখে, এতদসত্ত্বেও শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে বিনীত অনুরোধ যে বইখানিকে আরও উৎকৃষ্ট করার জন্য তাঁরা যেন তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানান।

প্রেসিডেন্সি কলেজ
৩রা, ডিসেম্বর, ১৯৭৪

নীরেন সেন

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান

বিভক্ত সোনার বাঙলা

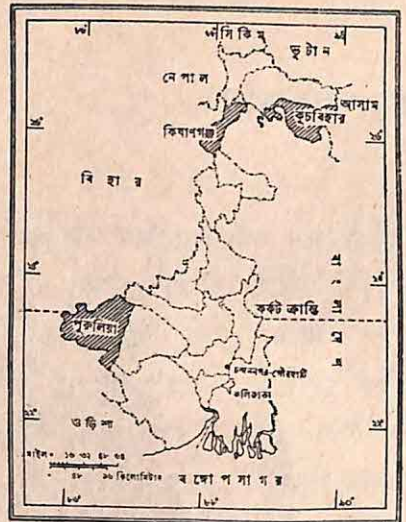
সবাই জানে বঙ্গদেশের পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু আধুনিক মানচিত্রে বঙ্গদেশ কোথায়? তাহলে 'বঙ্গ' কি অলীক কল্পনার দেশ? না। পরাধীন ভারতের মানচিত্রে বঙ্গদেশ নামে একটি প্রদেশ ছিল। বঙ্গদেশের একটা বাস্তব ভৌগোলিক চেহারাও আছে। বঙ্গদেশ এক নদীমাতৃক সমভূমি যার এক অংশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ; এর উত্তরে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত, দক্ষিণে বৃহত্তম উপসাগর, পূর্বে সবচেয়ে বর্ষণ-মুখরিত পাহাড় ও পশ্চিমে ভারতের সবচেয়ে সম্পদশালী মালভূমি।

বঙ্গভূমির এই আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ভৌগোলিক সত্তাকে ইতিহাস বারবার অস্বীকার করেছে। তাই ১৯৪৭ সালে বঙ্গ-বিভাগকে স্বীকার করে ভারত স্বাধীন হয়। তখন ভারত ইউনিয়নের অন্যতম অঙ্গরাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়। ফলে বাঙালী হিন্দু হারায় বাঙলার যৌবনভূমি, বাঙালী মুসলমান হারায় বাঙলার সংস্কৃতি ভূমি। পশ্চিমবঙ্গ হারায় বাঙলার কৃষি সম্পদ, পূর্ববঙ্গ হারায় বাঙলার শিল্প সম্পদ। পূর্ববঙ্গ এখন একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র—নাম বাংলাদেশ।

পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবিকাশ

মানচিত্রে দেখা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশঃ বড় হয়েছে। ১৯৪৮ এ কোচবিহার রাজ্য, ১৯৫৪তে ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর-গৌরহাটি

এবং ১৯৫৬তে বিহারের পুরুলিয়া মহকুমা ও কিষানগঞ্জ মহকুমার কিছু অংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখন এই রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃতি ৬২৩ কি মি, পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৯ কি মি এবং মোট আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কি মি। পশ্চিম-বঙ্গে ১৬টি জেলায় প্রায় ৪০,০০০ গ্রাম ও ২২৩টি শহর আছে।



মানচিত্রে রাজ্যের পরিসর

পশ্চিমবঙ্গ ২১° ৩০′ উত্তর (নতুন দ্বীপ) থেকে ২৭০° ১৩′ ০৪″ উত্তর অক্ষাংশ (ফালুত শৃঙ্গ) এবং ৮৫° ৪৯′ পূর্ব (সুবর্ণরেখা নদী) থেকে ৮৯° ৫৩′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের (সঙ্কোশ নদী) মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে গেছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত।

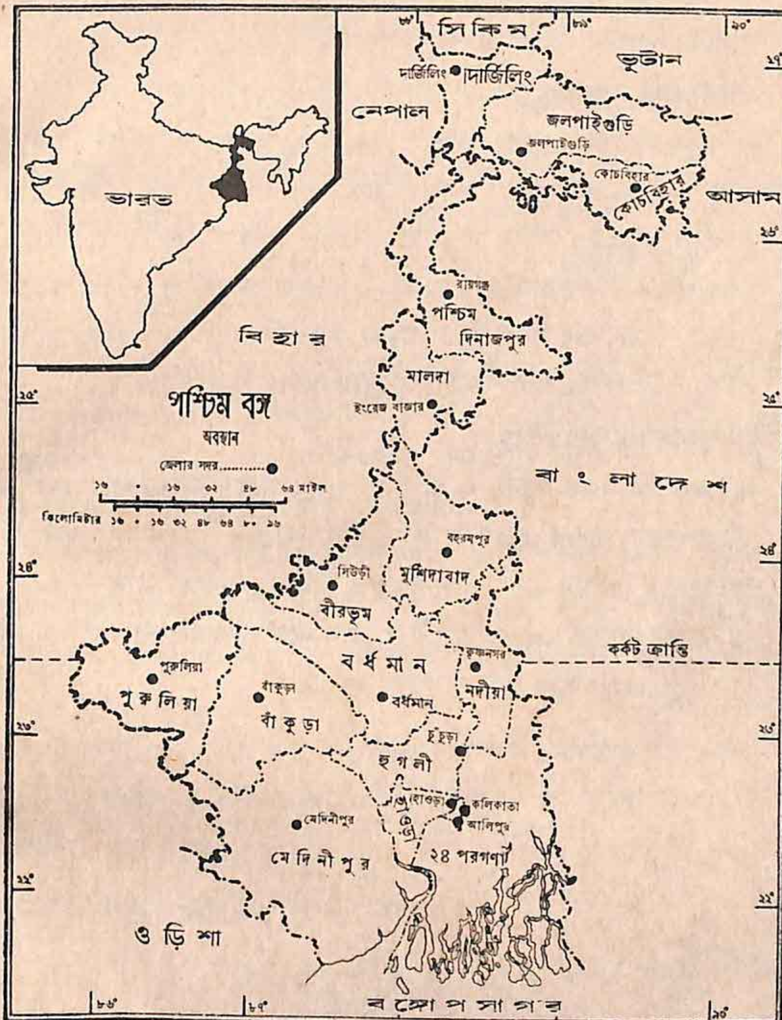
ভাষা ও ধর্ম ভিত্তিক সীমা

দেশের সীমানা যখন নদী বা পাহাড় বরাবর চলে তখন তাকে প্রাকৃতিক সীমা বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সীমারেখার কিছুটা প্রাকৃতিক, বাকিটা প্রশাসনিক। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গে ভাষা ও ধর্মের পার্থক্যের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র প্রশাসনিক সীমানা নির্ধারিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সীমা

পশ্চিমবঙ্গকে ৪টি স্বাধীন রাষ্ট্র নেপাল, সিকিম, ভুটান ও বাংলাদেশ উত্তরে ও পূর্বে বেষ্টন করে আছে। তাছাড়া উত্তরে নাথু লা ও জেজি লা

গিরিবর্ত্ম দিয়ে তিব্বত থেকে পশ্চিমবঙ্গের দূরত্ব খুব সামান্য। ভারতের



অন্য কোনও রাজ্যের পাশে এতগুলি স্বাধীন প্রতিবেশী দেশ নেই।

সমুদ্রপথে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভূ-ভারতের যে কোনও বন্দরে যাওয়া যায়। আবার সমুদ্র দিয়ে শত্রুর আক্রমণও আসতে পারে। তাই বঙ্গোপ-সাগরের উপকূলও ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত।

প্রতিবেশী রাজ্য

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্বে আসাম, পশ্চিমে বিহার ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িশা রাজ্য অবস্থিত। পূর্ব ভারতে যাবার সমস্ত পথ পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে গেছে। বন্যায় উত্তরবঙ্গে রেল ও রাস্তার প্রায়ই ক্ষতি হয়। তখন পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, শুধু হিমালয়ের পার্বত্য রাষ্ট্রগুলি নয়, সমগ্র পূর্ব-ভারতের ভাগ্য ও নিরাপত্তা পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

পূর্বভারতের হৃৎপিণ্ড

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিহার ও ওড়িশার তথা সারা ভারতের স্থল, জল ও আকাশপথে সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। কলকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে কাঁচা মাল ও শিল্প-শ্রমিক সরবরাহের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে শরীরের সম্পর্কের মত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল পরিচয়

পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে বহু অঞ্চলে ভাগ করা যায়। অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতি, ভাষা, ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে পরিবেশ তৈরি হয়।

পাহাড়, মালভূমি ও সমভূমির পরিবেশ এক হতে পারে না। পশ্চিম-বঙ্গের উত্তরের পর্বত, পশ্চিমের মালভূমি, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের সমভূমি, সুন্দরবনের তটভূমি ও মেদিনীপুরের বেলাভূমি ইত্যাদি প্রত্যেকটি এলাকার পরিবেশের নিজ নিজ চরিত্র আছে।

এই সব অঞ্চলের মানুষের জীবনধারার মধ্যেও অনেক তফাৎ। কারণ, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। সবাই জানে, দার্জিলিং-এর চা বাগান আর আসানসোলের কয়লাখনি বা কলকাতা শহর আর গ্রাম নিশ্চিন্দীপুরের পরিবেশ ও জীবনধারা এক নয়। এই পরিবেশের চরিত্র ও জীবনধারার বৈচিত্র্য আরও স্পষ্ট করে তোলা ভূগোলশাস্ত্রের লক্ষ্য। একটি একটি করে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি অঞ্চল ধরে আমরা এখন সেই লক্ষ্যের দিকে যাব।

জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চল

অবস্থান : জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ও কুমারগ্রাম থানার উত্তরে বক্সা-জয়ন্তী পাহাড়। এর পশ্চিমে তোর্সা উপত্যকা। পূর্ব সীমায় রায়ডাক নদী গভীর বনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। দক্ষিণে পাহাড়-

ঢালতে ডুয়ার্সের সারি সারি চা বাগান। এটি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ছোট, বিচ্ছিন্ন ও অনুন্নত অঞ্চল।

ভূ-প্রকৃতি ও নদনদী : ডিমা, চেকো ও জয়ন্তী নদী এখানে বৃষ্টির জলে উৎপন্ন হয়ে সমভূমিতে নেমেছে। পাহাড়টি খুব খাড়া। তাই নদী-গুলি খরস্রোতা। বক্সা-জয়ন্তী পাহাড় ভুটানের সিঞ্চুলা শৈলশ্রেণীর দক্ষিণপ্রান্ত। ছোট সিঞ্চুলা এখানকার সর্বোচ্চ (১৭৩৭ মি) শিখর। নদীগুলিকে সবুজ পাহাড়ের গায়ে আঁচড়ের দাগের মত দেখায়।

জলহাওয়া : এখানকার জলহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। শীতকাল বাদে সারা বছরই বর্ষা হয়। বক্সা ক্যান্টনমেন্টে গ্রীষ্মকালেও রাত্রে কম্বল লাগে ও দিনে পাখার দরকার হয় না।

প্রাকৃতিক সম্পদ : জয়ন্তীতে কয়লা ও বক্সায় ডলোমাইট, তামা ও কিছু লোহা আছে। বক্সা-জয়ন্তী পাহাড়ের প্রায় সবটাই নিবিড়, দুর্গম বনভূমি। দুর্গমতার জন্য এই চিরসবুজ অঞ্চলে মূল্যবান বনজ ও খনিজ সম্পদ থেকেও নেই।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : এখানে রাস্তা খুব কম। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত মিটারগেজ রেলপথে পাহাড়ের কোলে বক্সা রোড পর্যন্ত যাওয়া যায়। একটি রাস্তা এই স্টেশন থেকে এবং আর একটি জয়ন্তী থেকে বক্সা দুর্গ হয়ে ভুটানে গেছে। এই রাস্তায় ভুটান থেকে হাতীর দাঁত, মৃগনাভি, পশম, মোম, মধু, এণ্ডি, রেশম ও কম্বল আমদানী হয় এবং ভারত থেকে চাল, তামাক, মিলের কাপড় ও পান ইত্যাদি রপ্তানী হয়।

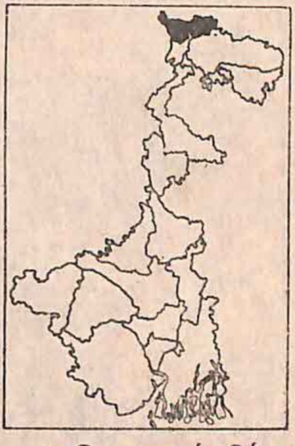
জীবনধারা : এই বন্ধুর অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তা না থাকায় সভ্যতার আলো আসে না। চা বাগান বাদে এখানে মাত্র ৫টি গ্রাম—সেখানে টোটো, মেচ, রভা, গারো প্রভৃতি বনচর উপজাতিরা বাস করে। এরা শিকার, পশুপালন ও জঙ্গল পুড়িয়ে ঝুম চাষ করে। ঢালু পাহাড়,

বছরে প্রায় ৫০০০ মি মি বৃষ্টি ও লালচে দোআঁশ মাটি চা গাছের অনুকূল। তাই পাহাড়তলিতে জঙ্গল সাফ করে চা বাগান হয়েছে। জনহীন বনে শ্রমিক পাওয়া যায় নি। তাই বিহার ও নেপাল থেকে মহলি, ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, লোধা ও নেপালীরা এখানে কাজ করতে আসে। চা-বাগানের নতুন পরিবেশে এদের জীবনধারা বদলে গেল। এরা ছিল বনচর পশুপালক বা কৃষিজীবী, এখন তারা চা বাগানে শ্রমজীবী।

বক্সা এখানকার একমাত্র বাজার। বক্সা দুর্গ এক সময় জেল ছিল। এখন এখানে একটি তিব্বতী লামা আশ্রম হয়েছে।

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল

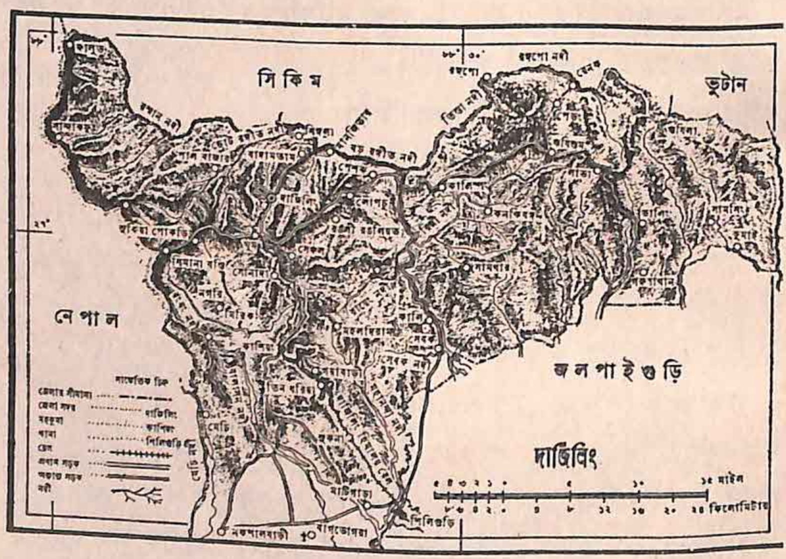
অবস্থান : সিকিম-তিব্বত সীমান্তে চির তুষারাবৃত হিমালয়। এই বৃহৎ হিমালয়ের অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি শাখা দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল গঠন করেছে। পশ্চিমের শাখাটির নাম সিঙ্গালিলা, পূর্বের চোলা। সিঙ্গালিলা শ্রেণী দার্জিলিং ও কার্সিয়াং মহকুমাকে এবং চোলা শ্রেণী কালিম্পং মহকুমাকে জড়িয়ে আছে। এই অঞ্চলের পশ্চিমে নেপাল, উত্তরে সিকিম, পূর্বে ভুটান ও দক্ষিণে উত্তরবঙ্গের সমভূমি।



ভূ-প্রকৃতি : ঘন বনে ঢাকা এলোমেলো বহু শাখায় বিভক্ত উঁচু পর্বতশিরা এবং আঁকাবাঁকা গভীর নদীখাত এখানকার ভূপ্রকৃতির মূল বৈশিষ্ট্য। সিঙ্গালিলা ও চোলা পর্বতশ্রেণীর শাখা-প্রশাখাগুলিকে দণ্ড বলে। দণ্ডগুলির ভাঁজে ভাঁজে ছোট নালা বা উপনদীকে এখানে খোলা বলে। পাহাড়ের উপরের দিকে দণ্ড ও খোলার অসংখ্য ঢেউ, আর

নিচের দিকে গভীর নদীখাতে গড়া বন্ধুর প্রকৃতিকে আঁকাবাঁকা রাস্তা ও ধাপে ধাপে চাষ করে মানুষ বশে এনেছে। সিঙ্গালিলার উপর ৩৬০১ মিটার উঁচু ফালুত শীর্ষে দার্জিলিং, সিকিম ও নেপালের সীমানা এসে মিশেছে। দার্জিলিং-এর এই উত্তর পশ্চিম দিকটাই সবচেয়ে উঁচু। সিঙ্গালিলার মূল শিরাটি ফালুত থেকে দক্ষিণে মণিভঞ্জন পর্যন্ত এসে পূর্ব দিকে ঘুরে টাইগার হিল পর্যন্ত গেছে। টাইগার হিলের উত্তরে একটি দণ্ডের উপর দার্জিলিং শহর। চোলা পর্বতশ্রেণীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ঋষি লা (৩১৫৯ মিটার)। ঋষি লা থেকে চোলার শাখা-প্রশাখাগুলি জটিল গোলকধাঁধার মত কালিম্পং মহকুমায় ছড়িয়ে আছে (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

নদনদী : দার্জিলিঙের বড় নদীগুলি গভীর উপত্যকা দিয়ে দক্ষিণে



প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু ছোট খোলাগুলি এলোমেলোভাবে চারিদিকেই প্রবাহিত হয় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ঘুম ও ঋষি লার চারপাশ দিয়ে নদী

নেমেছে। খোলাগুলি শেষপর্যন্ত দক্ষিণগামী বড় নদীগুলিতে মেশে। এইভাবে মহানন্দা, বালাসন ও মেচী নদীতে সিঙ্গালিলা পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সব বৃষ্টির জল নেমে আসে। বাকি অংশের বর্ষণধারা তিস্তা ও জলঢাকা দিয়ে নামে। এ ছুটিতে বরফগলা জলও থাকে। তিব্বতের লাচেন ও সিকিমের লাচুং নদী মিলে তিস্তা হয়েছে। দার্জিলিং-এ তিস্তা গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়ে সমভূমিতে নেমেছে। তিস্তার ডানদিকে সিঙ্গালিলা, বামদিকে চোলা। বড়-রঙ্গীত দার্জিলিং-সিকিমের সীমানা বরাবর পূর্বদিকে বইছে। রম্মান, ঘুম থেকে উৎপন্ন ছোট-রঙ্গীত ও অন্যান্য ৪টি খোলার সবুজ স্বচ্ছ জল নিয়ে বড়-রঙ্গীত তিস্তার কালো জলের সঙ্গে মিশেছে। সিকিমের দিচু ও ঋষি লাতে উৎপন্ন নীচু মিলে জলঢাকা হয়েছে। দার্জিলিং ও ভুটান থেকে অসংখ্য খোলা জলঢাকায় মিশেছে। কালিম্পং-এ উৎপন্ন চেল, লেঠি, লিশ ও গিশ নদীরও অসংখ্য খোলা আছে।

বন্যা ও ধস : সব পাহাড়ী নদীই অত্যন্ত খরস্রোতা। বর্ষাকালে হঠাৎ বন্যা হয়। তাছাড়া পাথর ও হড়হড়ে মাটি হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে। একে ধস নামা বলে। প্রলয়ঙ্কর বন্যা ও ধস দার্জিলিং-এর সমস্যা।

প্রস্রবণ ও ঝরনা : পার্বত্য অঞ্চলে বহু প্রস্রবণ ও ঝরনা থাকে। সেঞ্চলের কৃত্রিম হ্রদ থেকে দার্জিলিং-এ যে জল সরবরাহ হয় তা আসলে ২৬টি নির্ঝরের জল।

পাহাড়ী মাটি : এখানকার মাটি অগভীর। কারণ ঢালু পাহাড়ে মাটি জমতে পারে না। স্যাঁতসেতে জঙ্গলে উর্বর কালো মাটি ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পাহাড়ের উপরে দেখা যায় বাদামী মাটি। শিলাচূর্ণ ও পচা লতাপাতা থেকে এইসব মাটির সৃষ্টি হয়েছে।

জলহাওয়া : ভূ-প্রকৃতির মত এখানকার জলবায়ুও বিচিত্র। একই দিনে যখন নিচু উপত্যকায় গুমোট গরম, শৈলশিরার উপরে তখন কনকনে ঠাণ্ডা। পাহাড়ের একদিক যখন মেঘে ঢাকা, বর্ষণক্লান্ত অন্য-দিকে তখন ঠাণ্ডা মিষ্টি রোদ। মে থেকে সেপ্টেম্বর বর্ষাকাল—তখন দার্জিলিং মেঘের রাজ্য ; এক নাগাড়ে বৃষ্টি, বন্যা ও ধস জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে।

শীতকালে খুব ঠাণ্ডা, তাপমাত্রা অনেক সময় হিমাঙ্কের নিচে নেমে আসে। শীতকালে স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকে। সান্দাক্‌ফু ও ফালুতে ও মাঝে মাঝে দার্জিলিং শহরেও তুষার পড়ে। গরমকালেও এখানে নাতিশীতোষ্ণ—গড় তাপমাত্রা ১৩° সে· থেকে ২০° সে-র মধ্যে থাকে। বর্ষার ৫ মাস ও শীতের ২ মাস বাদে এখানকার আবহাওয়া চমৎকার।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও পশুপক্ষী : আবহাওয়ার তারতম্যের ফলে এখানকার বনে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন রকমের গাছ জন্মায়। ১০০০ মি পর্যন্ত চিরসবুজ শাল, চাঁপ ও লবঙ্গের রাজত্ব। তার উপরে ক্রমশঃ নরমকাঠের পাতাঝরা গাছ ও শেষে ঝোপ ও তৃণভূমি দেখা দেয়। শেওলা, অরকিড ও বাঁশ সর্বত্রই দেখা যায়।

এখানে প্রায় ৩ লক্ষ একর বনভূমির সবটাই সংরক্ষিত। অভয়ারণ্য মাত্র একটি—এটি সেঞ্চলে অবস্থিত। পশুপক্ষীর মধ্যে বাঁদর, বেড়াল, ভালুক, পাণ্ডা, ভোঁদড়, বরাহ, হরিণ, নানা জাতের সাপ ও প্রায় ৮০০ রকমের পাখী উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র পরিবেশের গুণে এত হরেক রকমের বন্য প্রাণী এখানে একসঙ্গে জমা হয়েছে।

খনিজ সম্পদ : কোঁচকানো শিলার চাপে এখানকার কয়লা, আর্সেনিক, তামা, গ্র্যাফাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ দুমড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—ফলে এগুলি থেকেও নেই। মেচী উপত্যকায় লোহারগড়ের গভীর

অরণ্যে এক সময় লোহা তৈরি হত। সিকিম সীমান্তে এখনও কিছু তামা হয়। এখানে রাস্তা ও ঘর তৈরির পাথর খুব সহজলভ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : চা-শিল্প ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এখানে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বন্ধুরতা, খরবেগ নদী ও ধস পাহাড়ে রাস্তা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের অনেক বাধার সৃষ্টি করে। হাতী চলাচলের পথ ধরে এখানকার প্রথম রাস্তা হিল-কার্ট রোড তৈরি হয়। অন্যান্য পথের মধ্যে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক (কলকাতা-গ্যাঙটক), তিস্তা সেতু—দার্জিলিং—কালিম্পং (—জেলেপ-লা) সড়ক ও জলপাইগুড়ি—দার্জিলিং সরু রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ। চা-বাগানের রোপওয়ে মাল বহনের একটি সুন্দর ব্যবস্থা। এখানকার ঢালু আঁকাবাঁকা রাস্তায় জীপ একমাত্র আদর্শ বাহন।

জনবসতি : একশ বছর আগে এখানে কয়েকশো লেপচা ও ভুটিয়া ছাড়া কেউ বাস করত না। ক্রমে শৈলনিবাস, চা বাগান ও রাস্তাঘাট



সিঁড়ির মত ধাপ কেটে চাষ

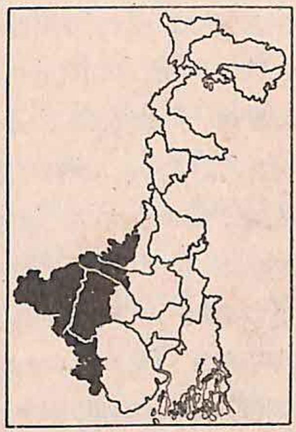
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। এখন এখানে নেপালী বেশি—৯০ শতাংশ লোকের মাতৃভাষা নেপালী। যাতায়াতের সুবিধার জন্য লোকে রাস্তার ধারে ধারে বাড়ি করেছে। রাস্তার সংযোগস্থলে সবচেয়ে ঘন জনবসতি হয়েছে। দার্জিলিং শহরে সবচেয়ে ঘন জনবসতি। শহর মাত্র তিনটি—দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্সিয়াং। গ্রাম ২২১টি। ১৯৭১ সালে প্রায় ৪ লক্ষ লোক গ্রামে ও ৮৩ হাজার লোক শহরে বাস করত।

জীবনধারা : নানা চা-বাগানে এবং মংপু, রংগো ও লাটপঞ্চরে ভেষজ ওষধির বাগানে প্রায় ৫৯ হাজার লোক কাজ করে। কৃষিজীবীর সংখ্যা প্রায় ৫৭ হাজার। সিঁড়ির মত ধাপ কেটে জমি সমতল করে নিয়ে এখানে চাষ হয়। দার্জিলিঙের চাষী খুব দক্ষতার সঙ্গে বাঁশের চোঙ ও লোহার নলের সাহায্যে পাহাড়ী নদী ও ঝরনা থেকে জলসেচ করে। উর্বর কালো মাটিতে ধান, গম, ভুট্টা, আলু, জোয়ার ইত্যাদি হয়। এলাচ, আদা ও অন্যান্য মশলার জন্যও দার্জিলিং উল্লেখযোগ্য। ফলের মধ্যে কমলালেবু ও কলা উল্লেখযোগ্য। গরমকালের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করে ফলের গাছ রোদ পায় না বলে এখানকার আপেল, নাশপাতি প্রভৃতি ফল পশ্চিম হিমালয়ের ফলের মত মিষ্টি হয় না। শহরগুলির আশেপাশে শাকসবজীর চাষ হয়। এখানে হেলে গরু নেই—চাষী নিজের হাতেই জমি তৈরি করে।

সংরক্ষিত বনভূমিতে বনপালন আর অ্যালপাইন তৃণভূমিতে পশুপালনও উল্লেখযোগ্য উপজীবিকা। পর্যটকদের থাকা খাওয়া ও আনন্দের পরিপাটি ব্যবস্থা করা একরকম শিল্প। এই শিল্পই দার্জিলিং শৈলনিবাসকে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে মশগুল করে রাখে। এখানকার পোলট্রি, ডেয়ারি, রেশমবস্ত্র ও তিব্বতী গালচে এবং নানান কুটিরশিল্প পর্যটকদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে।

পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল

অবস্থান : এই অঞ্চলটি ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বপ্রান্ত। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার রাঢ় সমভূমি থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। মুর্শিদাবাদে রাজমহল পাহাড়ও এই অঞ্চলের অংশ।



ভূগঠন ও ভূমিরূপ : কোটি কোটি বছর আগে প্রাচীন আগ্নেয় শিলা এই মালভূমি গঠন করেছিল (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। বহু যুগ ধরে ক্ষয় হয়ে মালভূমিটির এখন প্রায় সমভূমির দশা। এখানকার ভূমিরূপ বেশ ঢেউখেলানো। মাঝে মধ্যে ডুংরী বা টিলা পাহাড় (যেমন পাঞ্চেত, দলমা, অযোধ্যা, শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, মামাভাগ্নে ইত্যাদি)-ও আছে। অপেক্ষাকৃত শক্ত গ্রানাইট পাথরে তৈরি বলে ডুংরীগুলি এখনও তেমন ক্ষয় হয়নি। আগে সমস্ত জায়গাটি ডুংরীগুলির মত উঁচু ছিল (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই ভূগঠনে দুটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয়েছে : ১। রাজমহল ও দলমা পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে লাভা থেকে ; এবং ২। দামোদর উপত্যকা সৃষ্টি হয়েছে বেলেপাথর কয়লা প্রভৃতি নরম পাললিক শিলা থেকে।

নদনদী : এখানকার সাধারণ ঢাল অনুসরণ করে নদীগুলি পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়। সব নদীই বর্ষণপুষ্ট এবং পলিভূমি গড়ার চেয়ে মালভূমি ক্ষয়ের কাজ বেশি করে। শুধু বড় নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকে। এগুলির মধ্যে সাঁওতাল পরগনায় উৎপন্ন ময়ূরাক্ষী, অজয় ও দ্বারকা, পালামৌতে উৎপন্ন দামোদর, আদ্রার দক্ষিণে উৎপন্ন

দ্বারকেশ্বর, বাঁকুড়ার পশ্চিমপ্রান্তে উৎপন্ন শিলাই ও ঝালদার উত্তরে উৎপন্ন কাসাই নদী ভাগীরথীর উল্লেখযোগ্য উপনদী। দামোদর পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন নদী। একেবারে দক্ষিণে স্থবর্ণরেখা রাঁচী মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে পুরুলিয়ার পাশ দিয়ে এবং গোপীবল্লভপুর থানার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় এবং শেষ হয় বঙ্গোপসাগরে।

প্রস্রবণ ও জলাভূমি : এখানে কোনও স্বাভাবিক হ্রদ নেই। তবে কংসাবতী, পাঞ্চেত, মাইথন, দুর্গাপুর, মাসাঞ্জোর (বিহারের মধ্যে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধীন এলাকা) ও তিলপাড়ার কৃত্রিম জলাধার হ্রদের অভাব মিটিয়ে এখানকার পরিবেশকে বদলে দিচ্ছে (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ফাঁপা কয়লাখনির উপরের অংশ ধ্বসে পড়ায় রাণীগঞ্জের কাছে কিছু জলাভূমি হয়েছে। বীরভূমে বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ, অজয়ের ধারে বিষ্ণুপুর, দুর্গাপুরের কাছে ওয়ারগ্রাম ও শুশুনিয়ার প্রস্রবণ ছাড়াও এখানে অনেক ছোট ছোট প্রস্রবণ দেখা যায়।

বন্যা : বর্ষাকালে এখানকার নদীগুলি হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ওঠে। পুরুলিয়ায় এই জলোচ্ছ্বাসকে 'জোড়' বলে। জোড় হলে 'হুরপাহ্' (সাঁওতালী শব্দ—অর্থ 'হঠাৎ') বান হয়। বেনো জল ঢালু মালভূমিতে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না, খুব একটা ছড়ায়ও না। বাঁধ দেওয়ায় দামোদরে হুরপাহ্ বান আর হয় না। কিন্তু স্থবর্ণরেখায় এখনও কয়েক মিটার উঁচু জলপ্রাচীর মেঘ ডাকার মত শব্দ করতে করতে নেমে আসে।

মাটি : এখানে পশ্চিমদিকে কাঁকুরে লাল মাটি (পোশাকী নাম ল্যাটেরাইট্) ও পূর্ব দিকে রাঢ় সমভূমি পর্যন্ত মিহি লাল মাটি দেখা যায়। ল্যাটেরাইটের উপরটা ইটের মত কঠিন কিন্তু জল পেলে সহজেই কোমল হয়ে যায়। সেইজন্য বর্ষায় ল্যাটেরাইট্ খুব দ্রুত ক্ষয় হয়। ল্যাটেরাইট ক্ষয় হয়ে নদীর দুতীর বহু নালায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। এই

ক্ষতকে খোয়াই বা gully বলে। জলের জন্য ল্যাটেরাইট্ মাটিতে যতটা গভীর কূপ খুঁড়তে হয় লাল মাটিতে ততটা হয়না।

জলহাওয়া : এখানকার জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও চরমভাবাপন্ন। পাথুরে মাটি যেমন চট করে তেতে ওঠে তেমনি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডাও হয়। তাই এখানে শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার খুব তফাৎ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর আর্দ্রতার ফলে অসহ্য ভ্যাপসা গরম পড়ে। শীতের হিমেল হাওয়া উত্তর ও পশ্চিম থেকে আসে। শুধু এই অঞ্চলের মধ্যে নয় সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও আসানসোলে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে বৃষ্টিপাতও কম এবং অনিশ্চিত। কোনও বছরই ১৪০০ মি মি-র বেশি বৃষ্টি হয় না। প্রতি তিন বছরে একবার খরা হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্য প্রাণী : দুশো বছর আগে এই অঞ্চলের নাম ছিল 'জঙ্গল মহল'। কৃষি, শিল্প ও জ্বালানী কাঠের প্রয়োজনে সেই জঙ্গল ও তার সঙ্গে বন্য প্রাণী এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবু বীরভূমের চৌপহরী, বাঁকুড়ার শালতোড়া, পুরুলিয়ার বড়ভূম ও মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে শাল, আসন, বহেরা, কেঁদ, বাঁশ, পলাশ, কুল ইত্যাদি পাতাঝরা গাছ এখনও অবশিষ্ট আছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এখানেই কাঁটা জাতীয় বাবলা ও খয়ের এবং তাল গাছ বেশি। পলাশ গাছে লাক্ষা কীট, তুঁত গাছে রেশম কীট পালন করা হয়। এখানকার বনে সাপ, খরগোস, শেয়াল ও নানান ধরনের পাখী দেখা যায়।

খনিজ সম্পদ : এটি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনি অঞ্চল। এখানকার কয়লায় ভারতের শিল্পোন্নয়নের ভিত তৈরি হয়। দামোদর উপত্যকা ছাড়া রাজমহল পাহাড়েও কয়লা আছে। আকরিক লোহা, চুনা পাথর, চীনা মাটি, তামা, অভ্র, উলফ্রাম, কেওলিন প্রভৃতি নানা অংশে

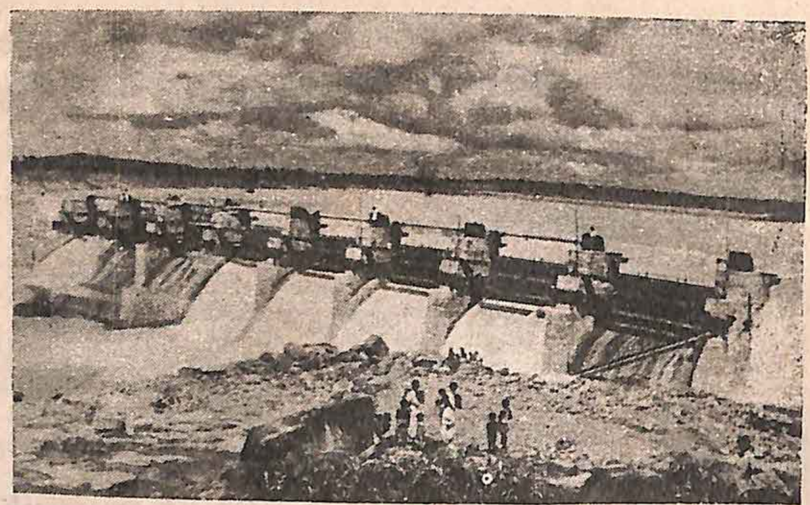
পাওয়া যায় (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এ ছাড়া এখানে রাস্তা তৈরির কাঁকর ও রাজমহলের ব্যাসল্ট পাথর, কাঁচ তৈরির জন্য নদীর বালি প্রভৃতি আছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : রেল ও সড়কপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে খনিজ সম্পদ ভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়। এই যোগাযোগের একদিকে কলকাতার বন্দর ও শিল্পাঞ্চল অন্যদিকে ছোটনাগপুরের খনিজ সম্পদ। দামোদর উপত্যকার কয়লাখনি অঞ্চল এই দুইয়ের মাঝামাঝি। সেইজন্য একদিকে যেমন কলকাতার সঙ্গে (দামোদরের পাশে) আসানসোল-দুর্গাপুরের যোগাযোগ হচ্ছে পূর্ব রেলপথ ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অন্যদিকে তেমন দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও ৩২ নং জাতীয় সড়ক প্রভৃতি ধানবাদ-আসানসোল থেকে জামসেদপুর ও দুমকা পর্যন্ত বিভিন্ন খনি ও শিল্পাঞ্চলকে যুক্ত করেছে। এ ছাড়া অসংখ্য রজ্জুপথ খনি অঞ্চলের একটা বৈশিষ্ট্য।

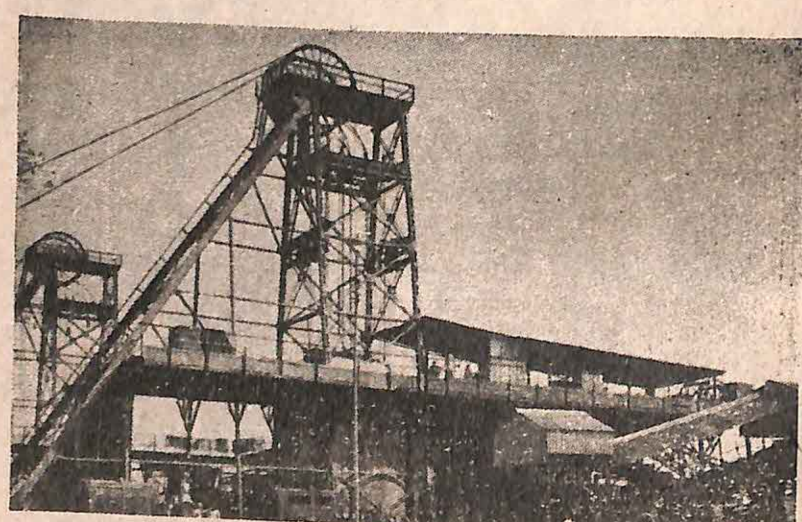
জনবসতি : আজকের সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাহলী, লোধা, ভূমিজ, হো প্রভৃতি আদিবাসীদের পূর্বপুরুষরা অজয় নদীর ধারে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এখানে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে সেই যুগের (৩,৫০০ বছর আগেকার) অনেক তামা ও লোহার জিনিস পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে আর্য সভ্যতার প্রভাবে এখানে একটা মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। সম্প্রতি যেখানেই খনি ও শিল্পের প্রসার হয়েছে সেখানেই জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে গেছে। সেইজন্য আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সবচেয়ে ঘন জনবসতি হয়েছে। অধিকাংশ শিল্প ও খনি শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে এসেছে। শিল্পাঞ্চলের তুলনায় কৃষি-ভূমিতে জনবসতির ঘনত্ব কম। জেলা সদর ছাড়া এখানে ৭টি উল্লেখযোগ্য শহর আছে—চিত্তরঞ্জন, কুলটি, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল, দুর্গাপুর ও ঝাড়গ্রাম।



পশ্চিমের মালভূমি সংলগ্ন অঞ্চল
০ ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ কিলোমিটার
০ ১০ ২০ ৩০ ৪০ মাইল
দুমকা
ময়ূরাক্ষী জলাধার
ময়ূরাক্ষী নদী
মহম্মদ বাজার
রাজনগর
সিউড়ি
বীরভূম
মাইথন জলাধার
চিত্তরঞ্জন
ধানবাদ
ঝরিয়া
কয়লা খনি
বিহার
কুলটি
অজয় নদী
দুবরাজপুর
পাণ্ডবেশ্বর
আসানসোল
জয়দেব কেঁদুলী
বার্ণপুর
রাণীগঞ্জ
পাঞ্চেৎ জলাধার
রঘুনাথপুর
কয়লা খনি
শালতোড়া
অণ্ডাল
দুর্গাপুর
বর্ধমান
পানাগড়
চাস
আদ্রা
গঙ্গাজলঘাটি
দামোদর নদী
জয়পুর
ঝালদা
ঝাঁটিপাহাড়ি
ছাতনা
বেলিয়াতোড়
পুরুলিয়া
পুরুলিয়া
কাঁসাই নদী
বাঁকুড়া
বাঘমুণ্ডি
ইঁদপুর
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
বলরামপুর
মানবাজার
কংসাবতী জলাধার
তালডাংরা
বরাভূম
খাতড়া
বিহার
রাণীবাঁধ
সিমলাপাল
ঝিলিমিলি
জামসেদপুর
ফুলকুসুম
রাখা তামা খনি
ঘাটশিলা
ভীমপুর
কংসাবতী নদী
মেদিনীপুর
গিধনি
ঝাড়গ্রাম
কলাইকুণ্ডা
হাওড়া
মেদিনীপুর
গোপীবল্লভপুর
সুবর্ণরেখা নদী
নয়াগ্রাম
ওড়িশা
পশ্চিম বঙ্গের সমভূমি
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
রাজ্যের সীমানা
জেলার সীমানা
থানার সীমানা
জেলার সদর
মহকুমার সদর
স্থানীয় উচ্চতা ▲ ৯৪ মিটার
খনি
রেলপথ
প্রধান সড়ক
অন্যান্য সড়ক
বিমান বন্দর
জলাধার
মালভূমি
নদী
নদীর চড়া



কংসাবতী জলাধার : নদীশাসনের ফলে পরিবেশের রূপান্তর



রাণীগঞ্জের কর্মব্যস্ত কয়লাখনি

জীবনধারা : এখানকার চাষী অত্যন্ত গরীব—জমির উৎপাদনক্ষমতা এত কম যে সে যা উৎপন্ন করে তাতে তার নিজেরই কুলোয় না, বেচবার মত উদ্বৃত্ত তো দূরের কথা। এই ধরনের জীবনধারার পোশাকী নাম 'subsistence'। কেনাবেচা না হলে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ



আদিবাসী শ্রমিক

হয় না। এই জন্যই আদিবাসীরা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পেছিয়ে আছে। কিন্তু ঐ প্রতিকূল পরিবেশই তাদের খুব স্বনির্ভর ও গোষ্ঠীবদ্ধ করেছে। সাধারণতঃ এখানে বছরে একবারই চাষ হয়। নিচু জমিতে আমন ধান ও ঢালু জমিতে আউস ধান, ভুট্টা ও কলাই ডাল প্রধান শস্য। উঁচু জমিতে সাধারণতঃ চাষ হয় না। কৃষি ছাড়া

২

পশুপালন, লাক্ষা কীট ও রেশম গুটি প্রভৃতি বনজ সম্পদ এদের জীবনধারার একটি বিশেষ দিক। ঝালদা লাক্ষাশিল্প ও রঘুনাথপুর রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

এখানে একমাত্র দামোদর উপত্যকায় ধাতু ও অন্যান্য শিল্পের উৎপাদন হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরে শুধু আকর উৎপাদন হয়—আকর থেকে কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি। দামোদরের কয়লা থেকে যে জায়গাগুলি দূরে বা শিল্পের চাকা ঘোরাবার জন্য বিদ্যুৎ যেখানে পৌঁছয়নি সেখানে শিল্পের প্রসার হয়নি। ঐ সব জায়গায় শুধু কৃষিভিত্তিক শিল্প, যেমন ধানকল, বা বনজ সম্পদ ভিত্তিক শিল্প, যেমন কাঠচেরাই কল, হয়েছে।



দুর্গাপুর : পরিকল্পিত নগরবিন্যাস

দামোদর উপত্যকার কয়লাখনি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে দুর্গাপুর, কুলটি, বার্নপুর ও হীরাপুরের লৌহ-ইস্পাত কারখানা, দুর্গাপুরে কোক চুল্লী,

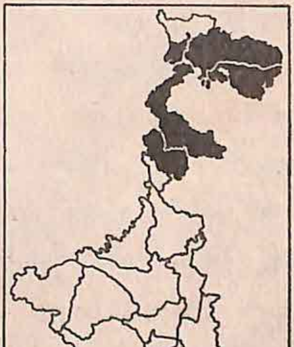
সার, রাসায়নিক ও মেশিন তৈরির কারখানা, জেকে নগরে অ্যালুমিনিয়ম তৈরির কারখানা, আসানসোলে কাচ ও সাইকেল, চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা, রাণীগঞ্জে কাগজ তৈরির কারখানা এবং রূপনারায়ণপুরে বৈদ্যুতিক তার তৈরির কারখানা। এ ছাড়া এখানে অনেকগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানাও হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের সমভূমি

অবস্থান : হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মালদহে কালিন্দ্রী নদী পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সমভূমি। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা জেলা এবং শিলিগুড়ি মহকুমা এই অংশে অবস্থিত।

ভূ-প্রকৃতি : মহানন্দা, তিস্তা, জলঢাকা, রায়ডাক ও সঙ্কোশ নদী এবং তাদের উপনদীগুলির পলি জমে এই সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। সবটাই নদীর দান। কিন্তু এই দান তিন রকমের– সেইজন্য উত্তর থেকে দক্ষিণে এখানকার ভূমিরূপও তিন ধরনের।

(১) তরাই ও ডুয়ার্সের বালি, নুড়ি: প্রধান সমভূমি : হিমালয়ের কোলে প্রায় ৮০ মি উঁচু একফালি জমিকে তরাই ও ডুয়ার্স বলে। নাম দুটো (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য), কিন্তু রূপ একই। তিস্তার পশ্চিমে তরাই, পূর্বে ডুয়ার্স। খরবেগ নদী পাহাড় থেকে যে তাল তাল পাথর, নুড়ি ও বালি নিয়ে আসে সেগুলি সমভূমিতে নদীখাতে জমে ওঠে। অগভীর নদীখাত বর্ষাকালের



বিশাল জলরাশিকে ধরে রাখতে পারে না। ফলে কূল উপছে বন্যা

হয় আর নদী নতুন খাতে বইতে শুরু করে। তরাই ও ডুয়ার্স এই ভাবে গড়ে উঠেছে।

(২) তাল সমভূমি : কোনও বিরাট হ্রদ ভরাট হয়ে উত্তর মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহারে তাল সমভূমি গড়ে উঠেছে। ডুয়ার্সের চেয়ে তালভূমির ঢাল কম, গড় উচ্চতাও ১৫ থেকে ২০ মিটারের মধ্যে।

(৩) বরেন্দ্রভূম : মালদা জেলার মাঝখান থেকে পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছড়িয়ে বরেন্দ্রভূমের বিস্তৃতি। গভীর নদীখাত ও কিছুটা ঢেউ তোলা ভূমিরূপ এখানকার বৈচিত্র্য। গঙ্গার পাড় অপেক্ষা বরেন্দ্রভূম কোথাও কোথাও ৩০ মিটারেরও বেশি উঁচু। প্রাচীনকালে মালদা পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ বঙ্গোপসাগরের তলায় ছিল। তখন সেই উপসাগরের উপকূল বরাবর যে চড়া পড়ে তা থেকেই বরেন্দ্রভূমির উৎপত্তি হয়।

নদনদী : এখানে গঙ্গার উপনদীগুলি দক্ষিণে ও যমুনার উপনদীগুলি ডুয়ার্স থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়। গঙ্গার প্রধান উপনদী মহানন্দা। মেচী ও বালাসন ডানদিক থেকে এবং নাগর, টাঙ্গন ও পুনর্ভবা বাঁদিক থেকে (মানচিত্র দ্রষ্টব্য) মহানন্দাতে মেশে। তরাইতে উৎপন্ন আত্রাই নদীর সামান্য অংশ বালুরঘাটের মধ্যে এসেছে। বর্ষায় গঙ্গার জল কালিন্দ্রী দিয়ে মহানন্দাতে আসে। কালিন্দ্রীর উত্তরে তালভূমি, দক্ষিণে দক্ষিণবঙ্গের দিয়ারা সমভূমি।

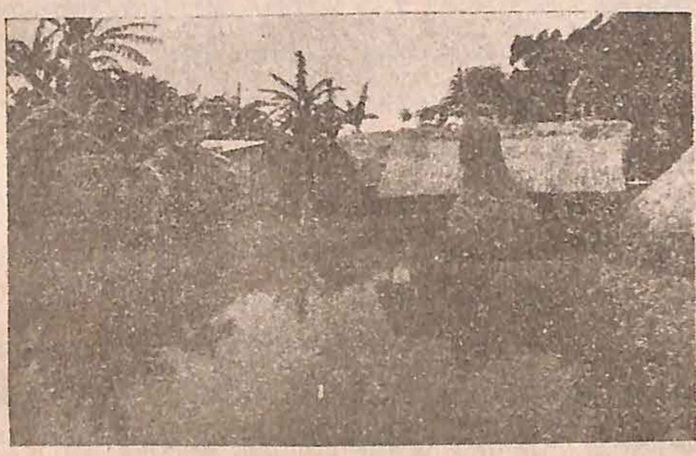
দুই শতাব্দী আগে তিস্তার জল আত্রাই ও পুনর্ভবা দিয়ে বইত। তখন এটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথ ছিল। তিস্তা ১৭৮৭ সালে গঙ্গা থেকে যমুনার দিকে গতি বদলায়। এখানে লিশ, গিশ, চেল ও লেঠি তিস্তার প্রধান উপনদী।

জলঢাকাও অত্যন্ত খরস্রোতা ও পরিবর্তনশীল। ডুয়ার্সে মূর্তি ও ডাইয়ানা এবং কুচবিহারে গিলান্দি, মনশাই, শুটুঙ্গা, ধরলা প্রভৃতি

জলঢাকায় পড়েছে। বরফপুষ্ট ধরলাকে ভুটানে আমো ও কোচবিহারে তোর্সা বলে। রায়ডাক ও সঙ্কোশ নদীও হিমালয়ের বরফপুষ্ট। কালজানি দিয়ে কাঠ চালান যায়।

জলাভূমি : তাল মানেই হ্রদ ; তালভূমিতে অনেক চরা, দরা ও বিল আছে। নদী সরে গেলেও পুরনো খাতে টুকরো টুকরো জলাভূমি রেখে গেছে। পাট পচানোর জন্য এগুলির অসীম গুরুত্ব।

বন্যা : পরিবেশ আলোচনায় এই সমভূমির উত্তর দিকের বন্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ষার প্রলয়নাচন যেন গিরিরাজের জটার বাঁধন খুলে দেয়। আর উন্মত্ত নদনদী দিশাহারা হয়ে সমভূমিকে ভাসিয়ে দেয়। অনেক সময় নদীর মূল ধারা ভরাট খাত ছেড়ে 'জামপয়' বা



উত্তরবঙ্গে বন্যায় জলমগ্ন গ্রাম

সেচখাল দিয়ে বইতে থাকে। তরাই ও ডুয়ার্সে নদী কেন গতি পরিবর্তন করে সেকথা আগেই বলেছি। গত ৪০ বছর ধরে তোর্সা ক্রমাগত পূর্বদিকে সরে যাচ্ছে। ১৯৬৪ সালে শুধু তোর্সার বন্যাতেই ২৫,০০০

একর আবাদী জমি ও চা-বাগান ধুয়ে যায়। তিস্তা আরও ভয়ঙ্কর— উত্তরবঙ্গের দুঃখের নদী। পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদায় দক্ষিণগামী নদীগুলির খাত গভীর হওয়ায় বন্যা প্রায় হয় না। আবার দক্ষিণ মালদায় কালিন্দ্রীর জলে প্রতি বছর বন্যা হয়। উত্তরবঙ্গের বন্যা পূর্ব ভারতের সমস্যা।

মাটি : ডুয়ার্সের পাথুরে বেলে মাটি ও তালভূমির কালো কাদামাটি সহজেই চেনা যায়। বরেন্দ্রভূমে প্রাচীন বাদামী পলিমাটি আছে। এখানে শুধু নদী (পুনর্ভবা, টাঙ্গন) উপত্যকায় নবীন পলি ঐ প্রাচীন পলিকে ঢেকে দিয়েছে।

জলহাওয়া : পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তরের সমভূমি সবচেয়ে আর্দ্র ও উষ্ণ। 'তরাই' শব্দের মানে স্যাঁতসেঁতে। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি বাদে সারা বছরই বর্ষাকাল। জুলাইতে অবিরাম বৃষ্টি পড়ে। উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণে বৃষ্টি কম হয়। মালদায় বছরে ৬৭ দিনে মোট ১৫৪০ মিমি বৃষ্টি পড়ে। পূর্বে মৌসুমী বায়ু থেকে অধিকাংশ বৃষ্টি হয়। শুধু মালদাতে দখিনা বায়ু থেকে কিছুটা বৃষ্টি এবং আশ্বিন মাসে ঝড়জল হয়। শরতে আকাশ মেঘমুক্ত হলে হিম পড়ে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল। তখন হিমের সঙ্গে কুয়াশা নামে। জানুয়ারি সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাস। বসন্ত ক্ষণস্থায়ী, মাচ থেকেই গরমকালের শুরু। মে পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টি এবং মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টিও হয়। গরমকালের গড় তাপমাত্রা হয় ৩৭° সে। শীত থেকে গরমকাল অবধি এখানে শুকনো পশ্চিমাবায়ুর প্রভাব থাকে। এই বায়ুকে এখানে পছিয়া বলে। মালদাতে পছিয়ার প্রভাবে শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায়, আবার গরমকালে এর হলকায়

আগুন লাগলে গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে যায়। পছিয়া জোরে বইলে আগুনের ভয়ে এখানকার লোকেরা দিনের বেলা রান্না করে না।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বণ্য প্রাণী : পাহাড়ের কোল থেকে ৩৫-৪০ কি মি দক্ষিণ পর্যন্ত তরাই-ডুয়ার্সের বনভূমি বিস্তৃত। অত্যধিক আর্দ্রতার জন্য এই জঙ্গল খুব ঘন এবং চিরসবুজ। এখানে শাল, চাঁপ, সেগুন, জারুল, ছাতিম, অর্জুন, পোমা, বাঁশ ও বেত জন্মায়। এইসব গাছের কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র, বাড়ি ও রেলের স্লিপার তৈরি হয়। এই বনে হাতী, বাঘ, একশিঙ গণ্ডার, গৌর, সম্বর, চিত্তল, ককর, পাইথন ও কেউটে থাকে। মহানদী, জলদাপাড়া ও গরুমারার অভয়ারণ্যের বণ্য প্রাণী পর্যটকদের একটা বিশেষ আকর্ষণ। তাল ও বরেন্দ্রভূমে বন নেই কিন্তু নানান ফুল, ফল, বাঁশ, বট, শিমুল, শিশু, কদম, বাবলা, লতাঝোঁপ, পান ও মশলার (তেজপাতা, মরিচ) গাছ জন্মায়। জলাভূমিতে কচ্ছপ ও মাছ থাকে এবং শীত ও বর্ষায় নানা দেশের নানারকমের পাখীতে ভরে যায়। এগুলিতে শোলা ও শামুকের খোল পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদ : মাল ও বাগ্রাকোটে সামান্য কয়লা ও ভুটান সীমান্তে চুনাপাথর ছাড়া উত্তরবঙ্গের সমভূমিতে কোনও উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

যাতায়াত ব্যবস্থা : মানচিত্রে দেখা যাবে যে শিলিগুড়ির উপর দিয়ে গেছে (ক) ব্রড গেজ, মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ রেলপথ, (খ) ৩১, ৩১ A ও ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক, (গ) অন্যান্য রাজ্য ও জেলা সড়ক এবং (ঘ) আসাম থেকে বিহারে বরৌনী তৈলশোধনাগার পর্যন্ত নলপথ। এই পথগুলির অসীম গুরুত্ব। পূর্বভারতের শরীরে এগুলি প্রাণপ্রবাহী নাড়ীর কাজ করে। উত্তরবঙ্গের বন্যায় এই পথগুলির প্রায়ই ক্ষতি হয় ; তখন

উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন একমাত্র ভরসা আকাশপথ। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তর-বঙ্গের সমভূমিতে সর্বাধিক বিমানবন্দর আছে।

জনবসতি : এই সমভূমিতে প্রায় ৬৩ লক্ষ লোক বাস করে। মালদায় জনবসতির ঘনত্ব সর্বাধিক, তার পরেই যথাক্রমে কুচবিহার, পশ্চিম



দিনাজপুর, শিলিগুড়ি মহকুমা ও জলপাইগুড়ির স্থান। গ্রাম-প্রধান

জনবসতি এখানকার বৈশিষ্ট্য। মালদায় ৯৫% এবং অন্য জেলাগুলিতে ৯১% এরও বেশি লোক গ্রামবাসী। আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এখানকার $\frac{১}{৩}$ ভাগ লোক তফশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত জাত ও প্রায় $\frac{১}{৮}$ ভাগ লোক আদিম উপজাতি।

জীবনধারা : উর্বর মাটি এখানকার প্রধান সম্পদ ; তাই চাষবাস এখানকার জীবনধারার মূল বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তরবঙ্গের সমতলক্ষেত্রে চাষজমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। মালদায় মোট জমির ৮০%-এ ও পশ্চিম দিনাজপুরে ৭৭%-এ চাষ হয়। বরেন্দ্রভূমে আমন ধান প্রধান শস্য। তাল সমভূমির নিচু অংশে বর্ষার আগে আউস ধান অথবা পাট এবং শীতকালে নানারকম ডাল ও তৈলবীজ-এর চাষ হয়। ডুয়ার্সে চা-বাগানের গুরুত্ব বেশি। শুধু নদীপ্লাবিত নিচু জমিতে ধান হয়। বনপালন ও দারুশিল্পের গুরুত্বও কম নয়। এখানে বহু কাঠগোলা ও করাতকল আছে। ডুয়ার্সে শ্রমজীবীদের অধিকাংশই ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, লোধা, মেচ ও মহলি উপজাতি। ডুয়ার্সে গরম বেশি বলে এখানকার চা দার্জিলিঙের চায়ের মত সুগন্ধী হয় না। কিন্তু এর রস (Liquor) আরও জোরালো হয়। গরম থেকে এই চা-ঝোপকে রক্ষা করে টুণ্ড নামে একরকম ছায়াতরু। উত্তরবঙ্গে অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে মেস্তা, তামাক, আখ, তুঁত এবং ফলের মধ্যে মালদার আম ও জলপাইগুড়ির জাম উল্লেখযোগ্য। তরাই ও ডুয়ার্সে অনেকে কৃষিকর্মের সঙ্গে পশুপালনও করে থাকেন। মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর ও জলপাই-গুড়িতে হাঁস-মুরগী পালনও একটা গুরুত্বপূর্ণ উপজীবিকা। উত্তরবঙ্গের সমভূমিতে শুধু চা, বনজ সম্পদ ও কৃষি-ভিত্তিক (যেমন ধান কল, তেল কল) বড় শিল্প গড়ে উঠেছে। কুটির শিল্প বলতে একমাত্র তাঁতের কাপড়ই উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল

অবস্থান : দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। প্রায় দুশো বছর আগে এখানে ভারতের নবজাগরণ শুরু হয় ; সেই থেকে এখানকার সাংস্কৃতিক পরিবেশ ক্রমশঃ বদলে



গেছে। এখান থেকেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঢেউ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পৌঁছায়। ভারতের ইতিহাসে দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি আধুনিক যুগপ্রবর্তক 'হিসাবে অবস্থান করছে।

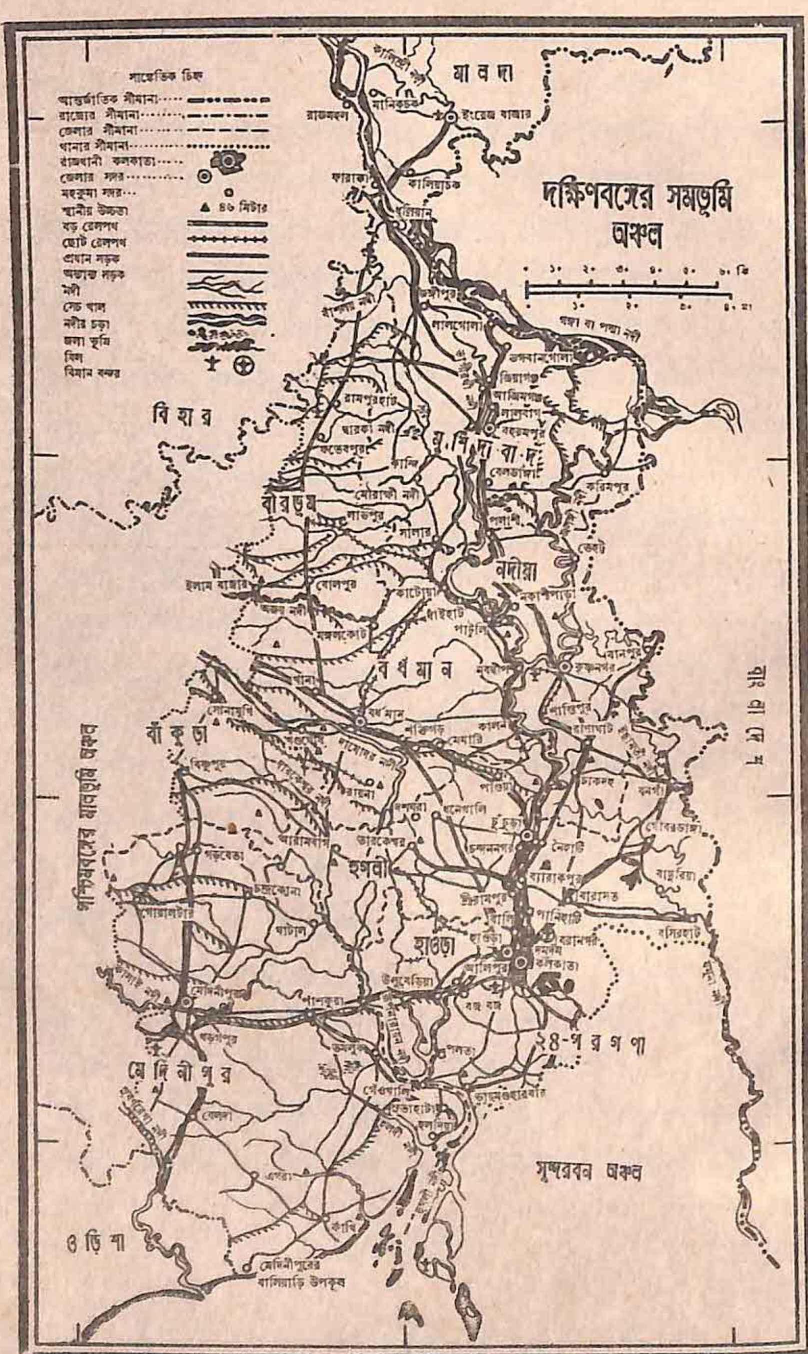
উত্তরে কালিন্দ্রী নদী থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের বালিয়াড়ি উপকূল পর্যন্ত (প্রায় ৭২০ কিলোমিটার) এবং পূর্বে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমের মালভূমিপ্রান্ত পর্যন্ত (প্রায় ৩৮০ কিলোমিটার) দক্ষিণ বঙ্গের সমভূমি বিস্তৃত। এই বিশাল অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৪২,৫০০ বর্গ কিলোমিটার ; কেরালা এর চেয়ে ছোট। এই সমভূমির মধ্যে আছে মালদা জেলার দক্ষিণাংশ ; বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশ ; হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও কলকাতা জেলার সবটুকু এবং চব্বিশ পরগণা জেলার উত্তরাংশ।

ভুপ্রকৃতি : দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি নদনদীর দান। অনেকগুলি বদ্বীপ জোড়া লেগে এই সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। ভাগীরথীর বাঁদিকে জমা হয়েছে গঙ্গামাটি আর পশ্চিমে অজয়, দামোদর, শিলাই, কাসাই প্রভৃতি নদীর পলি। আপাতদৃষ্টিতে এই সমভূমিকে একেবারে বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়ে সমতল মনে হয়—উচ্চতা কোথাও ৫০ মিটারের বেশি নয় ; নদীপাড়ের

উঁচু আড়ুলি, আঁকাবাঁকা নদী এবং নিচু জলাভূমি এই সমতল প্রান্তরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

জলাভূমি, নদনদী : ভাগীরথী নদী এই সমভূমিকে দুভাগে ভাগ করেছে। ভাগীরথীর পশ্চিমের নদীগুলি ভাগীরথীর উপনদী আর পূর্বের নদীগুলি পদ্মার শাখানদী। ভাগীরথীও গঙ্গার শাখা। মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের কাছে গঙ্গার মূল শাখা পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অপর শাখা ভাগীরথী, দক্ষিণমুখী হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ইংরেজ আমলে নবদ্বীপ থেকে এর দক্ষিণ অংশের নাম হয় হুগলী। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নদী বিশেষজ্ঞ উইলকক্স সাহেবের মতে ভাগীরথী একটি কৃত্রিম খাল, মহারাজা ভগীরথ সত্যিই খাল কেটে দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গঙ্গার বেশির ভাগ জল ভাগীরথী দিয়ে বইত। হুগলী জেলায় ত্রিবেণীর কাছে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে সেই বিশাল জলধারা চুলের বিনুনীর মত সর্পিল পথে সমুদ্রে মিশত। পশ্চিমের শাখাটিকে মজে যাওয়া সরস্বতী এবং পূর্বের শাখাটিকে পথহারা যমুনা নদী হিসাবে আজও চোখে পড়ে। এখন গঙ্গা থেকে ভাগীরথীতে যত জল আসে তার চেয়ে অনেক বেশি আসে পশ্চিমের অজয়, দামোদর প্রভৃতি উপনদীগুলি থেকে। মাল্লভূমি ক্ষয় করে এইসব উপনদী ভাগীরথীতে প্রচুর বালি ও পলি ফেলে। এগুলি ভাগীরথীর জলের সঙ্গে খুব ধীরে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাত্রা করে।

একে জমির ঢাল খুব সামান্য, তায় পলির ও বালির ভারে ক্লান্ত হয়ে ভাগীরথী কোনও রকমে এঁকেবেঁকে চলতে থাকে। উপরন্তু হুগলীর মোহনা থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত রোজ জোয়ার আসে। ফলে ভাগীরথী ক্রমাগত বিপরীতগামী সমুদ্রের জলে বাধা পায়। এইসব কারণে


দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের সীমানা
জেলার সীমানা
থানার সীমানা
রাজধানী কলকাতা
জেলার সদর
মহকুমা সদর
স্থানীয় উচ্চতা
৪৬ মিটার
বড় রেলপথ
ছোট রেলপথ
প্রধান সড়ক
অন্যান্য সড়ক
নদী
সেচ খাল
নদীর চড়া
জলা ভূমি
বিল
বিমান বন্দর
মালদা
বিহার
বাংলাদেশ
পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চল
ওড়িশা
গঙ্গা বা পদ্মা নদী
রাজমহল
মানিকচক
ইংরেজ বাজার
ফারাক্কা
কালিয়াচক
জঙ্গীপুর
লালগোলা
জিয়াগঞ্জ
আজিমগঞ্জ
রামপুরহাট
দ্বারকা নদী
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর
বেলডাঙা
কান্দি
করিমপুর
বীরভূম
ময়ূরাক্ষী নদী
লাভপুর
পলাশী
নদীয়া
বোলপুর
কাটোয়া
অজয় নদী
দাঁইহাট
পাটুলি
বর্ধমান
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর
বানপুর
শান্তিপুর
কালনা
মেমারি
সোনামুখী
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
দামোদর নদী
রানাঘাট
পাণ্ডুয়া
চাকদহ
বনগাঁ
আরামবাগ
তারকেশ্বর
হুগলী
চুঁচুড়া
চন্দননগর
নৈহাটি
ব্যারাকপুর
গোবরডাঙ্গা
বাদুড়িয়া
বারাসত
শ্রীরামপুর
বালি
পানিহাটি
হাওড়া
দমদম
কলকাতা
আলিপুর
বসিরহাট
গড়বেতা
চন্দ্রকোনা
গোয়ালতোড়
ঘাটাল
উলুবেড়িয়া
পাঁশকুড়া
মেদিনীপুর
বজবজ
২৪-পরগণা
তমলুক
ফলতা
মেদিনীপুর
ডায়মণ্ডহারবার
বেলদা
কুলপি
সুন্দরবন অঞ্চল
কাঁথি
মেদিনীপুরের বালিয়াড়ি উপকূল

ভাগীরথীতে ক্রমাগত বালি ও পলি জমে চড়া পড়ে। নদীতে জল বেশি থাকলে ভাটার টানে এগুলি সমুদ্রে চলে যেত এবং এত চড়া পড়ত না। কিন্তু ভাগীরথীতে গঙ্গার জল কম আসছে বলে ভাটার টান কমছে, জোয়ার বাড়ছে। ইদানীং উত্তরপ্রদেশে গঙ্গার অনেকটা জল খালসেচ করতে চলে যাচ্ছে, ফলে গঙ্গা থেকে ভাগীরথীতে যতটা জল আসা উচিত তা আসছে না। বড় জাহাজ অনেক কষ্টে চড়া বাঁচিয়ে কলকাতা বন্দরে আসে। ড্রেজার দিয়ে মাটি কেটে, চড়া ভেঙে ও নদীখাত গভীর করে কলকাতা বন্দরকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

ভাগীরথীর পূর্বতীরে বাংলাদেশে পদ্মা পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এই বদ্বীপের দুটি অংশ, একটি মুমূর্ষু এবং আর একটি পরিণত, দক্ষিণবঙ্গের সমভূমির মধ্যে এসেছে। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় মুমূর্ষু বদ্বীপ অঞ্চল। উত্তর চব্বিশ পরগনায় পরিণত বদ্বীপ অঞ্চল। বাগরি বা মুমূর্ষু বদ্বীপ অঞ্চলে ভৈরব-জলঙ্গী, কুমার, মাথাভাঙ্গা-চুর্ণী-ইছামতী প্রভৃতি পদ্মার শাখানদী গোলকধাঁধার মত আঁকাবাঁকা নদীখাত রচনা করেছে। পদ্মার সঙ্গে এগুলির এখন আর কোনও যোগ নেই, শুধু বর্ষাকালে কিছু জল আসে। পদ্মার জল যেখান দিয়ে ইছামতীতে ঢুকত সেখানে চড়া পড়ে গেছে বলে ইছামতীর আর এক নাম মাথাভাঙ্গা। মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এই নদীগুলি ক্রমশঃ মজে যাচ্ছে। নদীর প্রাণপ্রবাহ থেকে বঞ্চিত হয়ে বদ্বীপটিও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এই নদীগুলির কয়েকটি শাখা বাংলাদেশে গেছে আর কয়েকটি কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের পাশ দিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে। প্রতি বর্ষায় এগুলি খাত পরিবর্তন করে আর পুরনো খাত বা বাঁওড়ে জল থেকে যায়। মুর্শিদাবাদে **কালান্তর বিল** এইভাবে তৈরি।

পরিণত বদ্বীপের নদীনালাগুলি আরও প্রাণবন্ত। বছরে বছরে নতুন

পলি পড়ার ফলে নদীর পাড় ক্রমশঃ উঁচু ও শক্ত হয়ে স্বাভাবিক বাঁধের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিণত বদ্বীপ দক্ষিণে ক্রমশঃ সুন্দরবনের আরও সক্রিয় বদ্বীপে রূপান্তরিত হয়েছে। উত্তরে মুমূর্ষু বদ্বীপ থেকে বন্যার পলি এবং দক্ষিণে জোয়ারের টানে সামুদ্রিক তলানি উঠে এসে পরিণত বদ্বীপের দুপাশে জমেছে কিন্তু মধ্যিখানটা নিচু থেকে গেছে। সেইজন্য পরিণত বদ্বীপের মাঝখানে কিছু জলাভূমি থেকে গেছে। কলকাতার পাশে লবণহ্রদ এই ধরনের জলাভূমি।

দক্ষিণবঙ্গের সমভূমির একেবারে উত্তরে গঙ্গার দুপাশে দিয়ারা সমভূমি। গঙ্গার পাড় প্রতিবছর বন্যায় ভেঙে যায় এবং নদীবক্ষে নতুন নতুন দ্বীপ দেখা দেয়।

ভাগীরথীর পশ্চিমদিকের সমভূমির উপর দিয়ে যে সব নদী বইছে সেগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট। একেবারে উত্তরে মৌরাক্ষী ও তার উপনদী ব্রাহ্মণী, দ্বারকা বা বাবলা, বক্রেশ্বর এবং কোপাই প্রথমে সোজাভাবে এবং পরে আঁকাবাঁকা খাতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, কিন্তু সোজাসুজি ভাগীরথীতে মিশতে পারে না, ভাগীরথীর উঁচু স্বাভাবিক বাঁধে বাধা পেয়ে বাঁধের পশ্চিমে এক ফালি জমিকে জলমগ্ন করে। এই জলাভূমি মুর্শিদাবাদে **হিজল বিল** নামে খ্যাত। লালচে রাঢ় মাটি জমে হিজল বিল ক্রমশঃ ভরাট হয়ে আসছে। হিজল বিল দিয়ে ভাগীরথীর পাশাপাশি ৩০ কি মি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে এক ফাঁকে মৌরাক্ষী ভাগীরথীতে মেশে।

মৌরাক্ষী-ভাগীরথীর সঙ্গম থেকে ২০ কি মি দক্ষিণে কাটোয়ার কাছে অজয়-ভাগীরথীর সঙ্গম। এখানে ভাগীরথীর নদীখাত অজয়ের নদীখাতের চেয়ে উঁচু। তাই অজয়ের জল সহজে ভাগীরথী প্রবাহে মিশতে পারে না। বরং বর্ষাকালে ভাগীরথীর জল অজয় উপত্যকায় প্রবেশ করে বিরাট

অঞ্চলকে ভাসিয়ে দেয়। পূর্বগামী অজয়ের বিশাল বালুকাময় নদীবক্ষে বছরের অধিকাংশ সময় একটি শীর্ণ জলধারা আড়ষ্ট হয়ে থাকে ; কিন্তু বর্ষাকালে অজয়ের লাল কাদাজল দুকূল উপছে পড়ে।

অজয় উপত্যকার দক্ষিণে খারি, বাঁকা, কুন্তি, বেহুলা, গাঙ্গুর প্রভৃতি ছোট ছোট নদীর মৃতপ্রায় কিন্তু প্রশস্ত আঁকাবাঁকা খাত এখন দামোদরের সেচখাল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। অতীতে কোনও না কোনও সময়ে দামোদরের মূল প্রবাহ এইসব নদীখাত দিয়ে বইত। দামোদর নদী ঘন ঘন খাত পরিবর্তন করেছে। একসময় বেহুলা দিয়ে নয়াসরাইতে দামোদরের মূল জলধারা ভাগীরথীতে মিশত। সেই পূর্বগামী দামোদর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে খাত পরিবর্তন করতে করতে এখন হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে রূপনারায়ণ ও হুগলী নদীতে মিশছে। সেইজন্য বর্ধমান থেকে সমগ্র হুগলী ও হাওড়া জেলা এবং বাঁকুড়ার পূর্বাংশকে দামোদরের নিম্ন উপত্যকা অঞ্চল হিসাবে ধরা হয়। দামোদর থেকে বিচ্ছিন্ন নদী-গুলির দোয়াবে ও পরিত্যক্ত খাতে অনেক জলাভূমি থেকে গেছে।

দামোদর পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম নদী। দুর্গাপুর ব্যারাজ্ থেকে এর নিম্ন প্রবাহ শুরু হয়। এখান থেকে ডাইনে, বাঁয়ে উভয় দিকে লম্বা সেচখাল চলে গেছে পূর্বদিকের সমভূমিতে। দুর্গাপুর থেকে শক্তিগড় পর্যন্ত পূর্বদিকে বয়ে দামোদর হঠাৎ দক্ষিণে মোড় নেয়। এখান থেকেই দামোদরের ভয়ঙ্কর বন্যার জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেসব খাতে বেনোজল ঢোকে সেগুলিকে **হানা** বলে। বন্যা রোধের জন্য পানাগড় থেকে দামোদর-হুগলীর সঙ্গম ফলতা (কলকাতা থেকে ৪৮ কি মি দক্ষিণে) পর্যন্ত দামোদরের দুপাশে উঁচু বাঁধ দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে বিপদ বাড়ে। পলি জমে নদীখাত ভরাট হয়ে যায়। ফলে বাঁধ উপছে বা ভেঙে দুপাশে বন্যার জল ছড়িয়ে পড়ে। তখন দামোদরের ডানদিকের

বাঁধটি কেটে ফেলা হয়, যাতে বন্যার জল একদিকেই সীমাবদ্ধ থাকে; বাঁদিকে কলকাতা-আসানসোলের সংযোগকারী রেলপথ ও সড়ক বাঁচাবার জন্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর ফলে ডানদিকে অনেকগুলি হানা দেখা দেয় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে যায়। কতকগুলি হানা ক্রমে দামোদরের শাখা নদীতে পরিণত হয়। এখন দামোদরের মূল খাত দিয়ে যতটা না জল প্রবাহিত হয় তার চেয়ে বেশি যায় মুণ্ডেশ্বরী দিয়ে। মুণ্ডেশ্বরী হানা এখন নদী হয়ে গেছে। দ্বারকেশ্বর এবং শিলাই মুণ্ডেশ্বরীর উপনদী হয়ে গেছে। দ্বারকেশ্বর, শিলাই ও মুণ্ডেশ্বরীর যুক্ত জলধারাকে **রূপনারায়ণ** নদী বলে। রূপনারায়ণ গেঁওখালির কাছে হুগলীতে মিশেছে। উত্তরে খণ্ডঘোষ থানার কাছে সালি নদী দামোদরে মিশেছে। সমভূমিতে এই সালি ছাড়া দামোদরের আর কোনও উপনদী নেই, সবই শাখানদী। দামোদরের পশ্চিমে যেমন সক্রিয় হানা তেমনি পূর্বদিকে মৃতপ্রায় শাখা-নদীর প্রাধান্য। এই শাখানদীগুলির নামের সঙ্গে কানা, মজা, বোঁজা ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত থাকায় এগুলির অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু একসময় এইসব কানা নদী দিয়ে দামোদরের অনেক জল বইত। এখন এগুলিকে দামোদরের সেচখাল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

রূপনারায়ণের পশ্চিমে কাসাই বা কংসাবতী এবং এর উপনদী **কালিয়াঘাই** উল্লেখযোগ্য নদী। কংসাবতীর বাঁধ সমভূমির পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। **কাসাই** ও কালিয়াঘাই নদীর যুক্তপ্রবাহ হলদি নাম নিয়ে হলদিয়া বন্দরের পাশে হুগলীর সঙ্গে মিশেছে। **রূপনারায়ণ** (কোলাঘাট পর্যন্ত) **হিজলী খাল** এবং **হলদি নদী** এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। তমলুকের কাছে **তাম্রলিপ্ত** একসময় রূপনারায়ণের উপরে বিখ্যাত বন্দর ছিল। মেদিনীপুর জেলার পূর্বপ্রান্তে অনেক নিম্ন জলাভূমি আছে।

পুকুর : দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে অসংখ্য খাল বিল ইত্যাদি স্বাভাবিক

জলাশয় ছাড়াও অসংখ্য পুকুর আছে। শুধু ভাগীরথীর পশ্চিমে নিম্ন দামোদর উপত্যকাতেই ১৭,৩০০টি বড় বড় পুকুর আছে। এগুলি থেকে শুধু পানীয় জল নয়, প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হয়। বর্ধমান থানায় ভিটের চেয়ে পুকুরের সংখ্যা অনেক বেশি। নদীর বদ্বীপ গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই দামোদরের দুপাশে বাঁধ দিয়ে এখানে চাষবাস শুরু হয়ে যায়। সেইজন্য অনেক নিম্ন জলাভূমি অসম্পূর্ণ বদ্বীপের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এইসব জলাভূমিকে আরও গভীর করেও অনেক পুকুর হয়েছে।

বন্যা : দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে দুটি কারণে বন্যা হয়। (১) ভাগীরথী নদী উপত্যকায় এবং পূর্বদিকে মুমূর্ষু বদ্বীপ অঞ্চলে বন্যার কারণ এখানকার নদীখাতগুলির জল নিষ্কাশনের অক্ষমতা। (২) ভাগীরথীর পশ্চিমের সমভূমিতে বন্যার কারণ ছোটনাগপুর মালভূমিতে উৎপন্ন বর্ষণপুষ্ট নদীগুলিতে অত্যধিক বৃষ্টির ফলে হঠাৎ জলস্ফীতি। প্রথমোক্ত কারণে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে এবং হুগলী জেলার দক্ষিণভাগে একনাগাড়ে ৩ দিন বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়িয়ে যায়। কংসাবতী, পাঞ্চেত, মাইথন, দুর্গাপুর, মৌরাক্ষী ও তিলপাড়ার বাঁধ পশ্চিমের দিকে বন্যার প্রকোপ কিছুটা কমিয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ রোধ করতে পারে নি।

মাটি : ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের সমভূমিতে প্রাচীন পলি বা **বিন্ধ্য পাললিক** এবং পূর্বদিকের সমভূমিতে অপেক্ষাকৃত নবীন **গাঙ্গেয় পাললিক** দেখা যায়। বিন্ধ্য পাললিকে বালির দানা বড় এবং রং লালচে বাদামী। গাঙ্গেয় পাললিকের বালি সূক্ষ্ম, কাদার পরিমাণ বেশি এবং রং ধূসর। উভয় মাটিই উর্বর। তবে নদীর কাছাকাছি নবীন পলি বেশি উর্বর। নদী থেকে যত দূরে যাওয়া যায় পলি তত প্রাচীন হতে থাকে এবং তার তেজ কমতে থাকে। তবে নদীর কাছাকাছি এলাকার মাটিতে বালি

বেশি থাকে। নদী থেকে যতই দূরে যাওয়া যায় ততই কাদার পরিমাণ বাড়তে থাকে। দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে অধিকাংশ মাটিই কাদা ও বালি মেশানো দোআঁশ মাটি। মাটির রং, বালি ও কাদার পরিমাণের তারতম্য অনুসারে এদের নানান স্থানীয় নাম আছে। মুর্শিদাবাদে কালো কাদা মাটিকে **হেঁড়ে মেটেল,** বাদামী কাদা মাটিকে **বাঘা মেটেল,** লাল কাদা মাটিকে **রাঙ্গা মেটেল** বলে। বীরভূমের কাদা মাটিকে **এঁটেল,** বেলে মাটিকে **বিন্দি** এবং লাল ল্যাটেরাইট্ মাটিকে **কাঁকড়ে** বলে। মেদিনীপুরে নোনা মাটিকে **নোনা এঠেল** আর দোআঁশ মাটিকে **দোসেতা** বলে।

জলহাওয়া : ভাগীরথী-হুগলীর উভয় তীরের সমভূমি অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পার্থক্য পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে কম। সমুদ্র-সান্নিধ্যের জন্য উষ্ণতার খুব একটা পার্থক্য হয় না। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। উত্তপ্ত বায়ু ও জলাভূমির জলীয় বাষ্প মিশে আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র হয়। বিকেলের দিকে সমুদ্রের ঠাণ্ডা দখিনা বাতাস বইতে থাকে। কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টিতেও অসহ্য গরম থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়া যায়। কালবৈশাখীর মেঘের উচ্চতা সবচেয়ে বেশি। এজন্য শিলাবৃষ্টি হয়।

জুন থেকে সেপ্টেম্বর বর্ষাকাল। এই চার মাসে অবিশ্রান্ত বর্ষণে খাল বিল ঝিল ভরে ওঠে, বন্যা হয়। সমভূমিতে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪০০ থেকে ১৬০০ মি মি; তার মধ্যে ১২০০ মি মি বর্ষাকালেই হয়। মৌসুমী বৃষ্টিপাত দেরীতে শুরু হলে বা পরিমাণ মত না হলে কৃষির খুব ক্ষতি হয়। অক্টোবর-নভেম্বর দু'মাস শরৎকাল—তখন মৌসুমী বায়ু ফিরতে শুরু করে, আকাশে জলভরা মেঘের বদলে দেখা দেয় তুলোর মত হালকা সাদা মেঘ। শরতের মনোরম আবহাওয়া

স্বভাবতঃই বাঙালীর প্রাণে উৎসবের সাড়া জাগায়। ক্ষণস্থায়ী বসন্তের চেয়ে শরৎ ও হেমন্ত বেশি মনোরম বলেই এখানে **অকাল বোধনের** এত ঘটা। কিন্তু এই উৎসব মাঝে মাঝে আশ্বিনের দখিনা ঝড়ে ম্লান হয়ে যায়, বেশি বৃষ্টি হলে পাকধরা ধানের খুব ক্ষতি হয়। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ৩ মাস শীতের **উত্তুরে হাওয়া** বয়। এটিও ফিরতি মৌসুমী বায়ু।

শীতকালে গড় তাপমাত্রা হয় ১৫° সেন্টিগ্রেড। মাঝে মাঝে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শৈত্যপ্রবাহ তাপমাত্রাকে ৫° সেন্টিগ্রেড নামিয়ে দেয় ও সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটায়। শীতকালের শান্ত আবহাওয়াকে নষ্ট করে বলে একে **পশ্চিমী ঝামেলা** বলা হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : জনবসতি, কৃষি এবং শিল্প এখানকার স্বাভাবিক বনভূমিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এখন স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলতে বট, অশথ, তাল, নারকোল, বাঁশ ও বাবলা গাছ দেখা যায়। অনুর্বর জমিতে নানান ধরনের ঘাস, যেমন কাশ, উলুখড়, বেনা বা খস এবং জলাভূমিতে ২-৪ মানুষ লম্বা হোগলা, মাদুর কাটি, শোলা, পানিফল, কলমি ইত্যাদি উদ্ভিদ এখনও অবশিষ্ট আছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিবিড় পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবহারের ফলে এগুলিও আর বেশি দিন অবশিষ্ট থাকবে না। বনভূমি না থাকায় এখানে বন্যপ্রাণীরও যথেষ্ট অভাব আছে। শুধু মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে অভয়ারণ্যে, কিছু বন্য প্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। সেইরকম এখানকার জলাভূমিতেও মানুষের খাদ্য হিসাবে প্রচুর মাছের চাষ হয়ে থাকে। এখানকার জলাভূমিতে যে কচুরীপানা জন্মায় বা আমেরিকান কৈ মাছের চাষ হয় তা এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ বা জলজ প্রাণী নয়, বিদেশ থেকে এসেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এখানেই প্রথম অনেক বিদেশী ফসলের চাষ শুরু হয় যেমন পোর্তুগীজরা আমদানী

করে আলু। বীট, গাজর, টম্যাটো, সয়াবীন ইত্যাদিও এখানকার স্বাভাবিক ফসল নয়।

খনিজ সম্পদ : দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে খনিজ সম্পদ নেই বললেই চলে। কানা ও মজা দামোদরের খাতে, অজয় নদীখাতে এবং ত্রিবেণী-মগরায় সরস্বতীর খাতে বালি পাওয়া যায়। বাড়িঘর তৈরি ও কাচ শিল্পে বালি কাজে লেগেছে। কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, ও বর্ধমানে গভীর তৈলকূপের ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে কিন্তু কাজে লাগেনি ; কারণ ঐ তেল তুলতে হলে অনেক ব্যয়সাপেক্ষ কলাকৌশলের প্রয়োজন। তেলের সন্ধান করতে গিয়ে খুব গভীরে চুনাপাথর ও আর্টেজীয় জলাধারের (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) সন্ধান পাওয়া যায়। আর্টেজীয় জলাধারের ভৌমজল শান্তিনিকেতনে জলকষ্ট দূর করেছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা : প্রাচীন যুগ থেকেই এখানে স্থলপথে ও জলপথে যাতায়াত শুরু হয়। হুগলী জেলায় সরস্বতী নদীর উপর **সপ্তগ্রাম** বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। হাওড়া জেলার শিবপুর বট্যানিকাল গার্ডেনের পাশে অবস্থিত **বেতোড়**-ও সরস্বতীর একটি বিখ্যাত নদীবন্দর ছিল। অতীতে রেলপথ বা বিমানপথ ছিল না, ডাক ব্যবস্থা ছিল না, রাস্তাও খুব কম ছিল। জলপথই ছিল যোগাযোগের প্রধান উপায়। সেইজন্য সরস্বতীর দুই কূলে সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছিল। ঐ একই কারণে হুগলী নদীর দুই তীরে সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। নদীপথে মাল পরিবহণের খরচা সবচেয়ে কম—বিশেষ করে যেসব মাল ওজনে ভারী বা আয়তনে বিশাল হয় সেগুলি অনেক কম খরচে হুগলী নদীপথে চালান যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও উত্তরপ্রদেশ, কলকাতা ও আসামের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে জলপথগুলি অকর্মণ্য হয়ে গেলেও পরিবহণের দিক দিয়ে এই সমভূমি কেরালার

পরেই ভারতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। হুগলী বাঁকুড়ার মধ্য দিয়ে প্রাচীন অহল্যাবাই বা বেনারস সড়ক এবং শের শাহের আমলে তৈরি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (এখন ২নং জাতীয় সড়ক) কলকাতার সঙ্গে সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমির যোগাযোগ স্থাপন করে।

কলকাতা এই সমভূমির তথা সারা ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র। ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রায় ৪০% আমদানী ও রপ্তানী কলকাতা বন্দর দিয়ে হয়। কলকাতা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যেরও একটি প্রধান ঘাঁটি। কলকাতা শিল্পাঞ্চলও ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাইয়ের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। সুতরাং বাণিজ্যিক লেনদেন ও শিল্পাঞ্চলে মাল যোগান ও পণ্য চালান দেওয়ার জন্য এখান থেকে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব রেলপথ, ৬, ২, ৩৪ ও ৩৫ নং জাতীয় সড়ক সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। দমদম বিমানবন্দর দিয়ে কলকাতার সঙ্গে সারা বিশ্বের যোগাযোগ হয়।

এইসব রেলপথ ও জাতীয় সড়কের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সমভূমির অন্যান্য অংশের রাজ্য সড়ক, জেলা সড়ক ও গ্রাম্য সড়ক এবং ছোট হালকা রেলপথ দিয়ে যোগাযোগ হয়।

গ্রামাঞ্চলের জীবনধারা : দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে মোট অধিবাসীর দুই তৃতীয়াংশ গ্রামে থাকে। গ্রামীণ জনসমষ্টিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—চাষী, জেলে, কুটিরশিল্পী এবং মধ্যবিত্ত। অন্যান্য লাভজনক পেশায় নিযুক্ত ধনী লোকেদের শহরে বেশি দেখা যায়, কারণ সেখানে জীবনযাত্রার সুযোগসুবিধা বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও কৃষিজীবীদের ৪টি শ্রেণী : ১। জমির মালিক, কিন্তু নিজে চাষ করে না, অন্যকে দিয়ে চাষ করায় ; ২। জমির মালিক এবং নিজে চাষ করে ; ৩। ভাগচাষী, অপরের জমি চাষ করে ফসল ভাগ করে নেয় ; এবং ৪। জমিহীন ক্ষেত মজুর, অন্যের

জমিতে মজুরির বিনিময়ে কাজ করে। এদের মধ্যে ভাগচাষী ও ক্ষেত মজুরের সংখ্যাই বেশি এবং অধিকাংশ সময় ভূমিহীন ক্ষেত মজুরেরা বেকার থাকে। বংশপরম্পরায় ভূ-সম্পত্তি ক্রমাগত ভাগ হয়ে চাষের ক্ষেত টুকরো টুকরো হয়ে গেছে আর মাথাপিছু জমির পরিমাণও কমে গেছে। কম জমি থেকে কম আয় হয় তাই এখানকার চাষীরা গরীব। সেইজন্য দামী কৃষি যন্ত্রপাতির বদলে হাল-লাঙলই চাষের প্রধান উপকরণ থেকে গেছে। কিন্তু জমি উর্ব্বরা হওয়ায় এখানকার চাষী নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যবস্তু এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ফসলও উৎপন্ন করে।

ধান এখানে সর্বত্রই হয়। সমভূমির একেবারে উত্তরে গঙ্গার দু'তীরে দিয়ারা অঞ্চলে নিয়মিত বন্যা ও উর্বর দোআঁশ মাটিতে বছরে দু'বার



জলে পাট পচাই

ফসল ফলে। আউস ধান, গম, সরষে ও আখ ছাড়াও এখানে রেশম-

গুটির জন্য তুঁতের চাষ হয়। এখানকার আমবাগানও বিখ্যাত। ইদানীং এখানে হাঁস মুরগী পালনও অনেকের পেশা হয়েছে। মুমূর্ষু ও পরিণত বদ্বীপ অঞ্চলে ধান প্রধান খাদ্যশস্য এবং পাট প্রধান বাণিজ্যশস্য। নদীয়ার দ্বিফসলী জমিতে যত না আমন ধান হয় তার চেয়ে বেশি হয় ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি শীতকালীন রবিশস্য। উত্তর নদীয়া এবং দক্ষিণ মুর্শিদাবাদে (পলাশীতে অবস্থিত চিনিকলের জন্য) প্রচুর আখ হয়। উত্তর চব্বিশ পরগনায় এবং ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে শিল্পাঞ্চলের পাশে ছোট ছোট বাগানে নিবিড় পদ্ধতিতে বা যত্নের সঙ্গে শাকসবজীর চাষ হয়। মৌরাক্ষী ও নিম্ন দামোদর উপত্যকায় ধান প্রধান এবং প্রায় একমাত্র খাদ্যশস্য। তবে হুগলী এবং হাওড়াতে পাট এবং বর্ধমানে শীত-কালীন রবিশস্যের বিশেষতঃ আলুর উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়ছে।

ঘন বসতিময় দক্ষিণবঙ্গে অন্নসংস্থানের জন্য গ্রামজীবন খুবই কর্মব্যস্ত। ফসল বোনা ও কাটার পরে চাষী অবসর সময়ে গ্রামে নানান ধরনের কুটিরশিল্প থেকে বা শহরে দিন-মজুরের কাজ করে রোজগারের চেষ্টা করে। অনেকে শুধু কুটিরশিল্প থেকে জীবিকা চালায়। কুটিরশিল্পের মধ্যে ১। ফরাসডাঙা, ধনেখালি শান্তিপুরের তাঁত শিল্প ; ২। মুর্শিদাবাদ বিষ্ণুপুর মালদহের রেশম শিল্প ; ৩। কৃষ্ণনগর, কুমারটুলীর মাটির পুতুল ও প্রতিমা ; ৪। বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরের ছুরি, কাঁচি ; ৫। মুর্শিদাবাদ ও দাঁইহাটের কাঁসা পিতলের বাসন ; ৬। বিষ্ণুপুরের শাঁখের জিনিস ; ৭। মেদিনীপুরের মাদুর ; এবং ৮। মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের জিনিস বিখ্যাত।

এখানে জেলেরা ভেড়ীতে মাছের চাষ করে এবং লালগোলা, হাসনা-বাদ, ডায়মণ্ড হারবার, কোলাঘাট প্রভৃতি জায়গা থেকে খাঁড়ি ও নদীর মাছ জনবহুল শিল্পাঞ্চলে চালান দেয়। উপযুক্ত পশুচারণ ভূমির

অভাব থাকলেও দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ভারতের অন্যান্য অংশের চেয়ে কম নয়। এই সমভূমিতে যে পরিমাণ ছানা ও ছানার মিষ্টি তৈরি হয় তা ভারতের আর কোথাও হয় না।

গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরী করে। কেউ কেউ জমি ভাগে দিয়ে বা মহাজনী কারবার করেও আয় করে। সাধারণতঃ বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলিতেই এদের দেখা যায়। এইসব গ্রামে বিভিন্ন বৃত্তি ও জাতের লোক ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাস করে, যেমন—জেলেপাড়া, কামার-পাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া ইত্যাদি।

শহরাঞ্চলের জীবনধারা : দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে অনেক শহর আছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট ২২৩টি শহরের মধ্যে ১৬৮টি শহরই এই অঞ্চলে অবস্থিত ; আবার এইসব শহরের অধিকাংশই হুগলী নদীর দুই তীরের শিল্পনগরী। পশ্চিমতীরে ব্যাণ্ডেল থেকে উলুবেড়িয়া এবং পূর্বতীরে কল্যাণী থেকে বিড়লাপুর পর্যন্ত এই শিল্পাঞ্চল বিস্তৃত। শহর ও শিল্পাঞ্চলের জীবনধারার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জীবনধারার সাংস্কৃতিক পরিবেশের অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ শহরের লোকেরা খাদ্যদ্রব্যের জন্য গ্রামের উপর নির্ভর করে, কারণ শহরে চাষাবাদ করার জায়গা নেই। শহরে নানাভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় এবং সেই অর্থ খরচ করে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করা যায়। যেখানে জীবিকা অর্জন যত সহজ সেখানকার আকর্ষণ মানুষের কাছে তত বেশি। সেইজন্য স্বাভাবিক উর্বর সমভূমির থেকেও শিল্পাঞ্চলে জনবসতি অনেক বেশি ঘন। শিল্পতেই এখানকার অধিকাংশ লোকের কর্মসংস্থান হয়। অন্যান্যদের পেশা ব্যবসা বাণিজ্য, অফিস-আদালত, ব্যাঙ্ক, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদিতে চাকরী, ডাক্তারী, শিক্ষকতা এবং আইনগত পেশা। শিল্পাঞ্চলে যাত্রী ও মাল পরিবহণের কাজে এবং কলকাতা বন্দরেও অনেক লোক নিযুক্ত

আছে। এইসব কাজের জন্য শহরবাসীদের যথেষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কারিগরী দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এই জ্ঞান ও দক্ষতাই শহরের লোকেদের রোজগারের প্রধান মূলধন। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান ও বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ এখানকার স্বাভাবিক পরিবেশকে সাংস্কৃতিক পরিবেশ দিয়ে বদলে দিয়েছে, সমতল নদী উপত্যকায় আকাশছোঁয়া বাড়ি তুলেছে, রাস্তা ও রেল পেতেছে, বন্দর তৈরি করেছে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকে খনিজ বস্তু, কয়লা, পাট, তুলো, চামড়া, লোহা, অ্যালুমিনিয়ম ইত্যাদি আমদানী করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করছে, চটকল, কাগজকল, সূতি বস্ত্রের কারখানা, জাহাজ তৈরির কারখানা, নানান ধরনের যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ির কামরা, সাইকেল, মোটরগাড়ি, কাচ এবং বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির কারখানা, প্লাস্টিক ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির কারখানা এবং মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় নানান ধরনের ওষুধ, সাবান, জুতো ইত্যাদির কারখানা স্থাপন করেছে।

জনবসতি : ভারতবর্ষে প্রতি ১০ বছর অন্তর লোকগণনা বা আদমশুমার হয়। ১৯৭১ সালের গণনায় দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ১২ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি ৯ লক্ষ লোক দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে বাস করত। এখন এই সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের অন্যতম প্রধান ঘন বসতিময় অঞ্চল। কোন নির্দিষ্ট এলাকায় প্রতি বর্গ কিলোমিটার স্থানে যত জন লোক বাস করে তাকে বলা হয় লোকবসতির ঘনত্ব। দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৩১ জন। ভারতের সমস্ত অংশের জনবসতির গড় ঘনত্ব মাত্র ১৮২ এবং সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশেও এই ঘনত্ব মাত্র ৩০০। দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। গ্রামের চেয়ে শহরে ঘনত্ব বেশি,

কলকাতা শহরের ঘনত্ব, ৩০,২৭৬ আবার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় মাত্র ৩২৭। যেখানে অন্নসংস্থানের আশা থাকে সেখানেই ভীড় জমে মানুষের, অর্থাৎ ঘনত্বের সঙ্গে জীবিকার খুব সোজাসুজি সম্পর্ক থাকে।

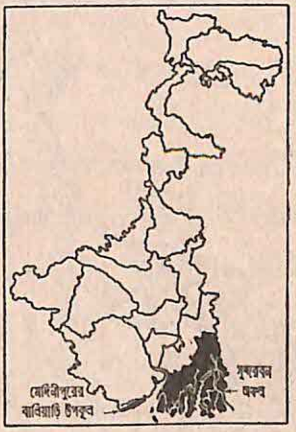
গ্রামে বসতি বিন্যাস : দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ স্থান খাল, বিল, নদী-নালায় পরিপূর্ণ। তাই অধিকাংশ গ্রাম বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছে। উঁচু জায়গায় জনবসতি এবং নিচু জায়গায় কৃষিক্ষেত্র নিয়ে গ্রাম হয়। অনেক জায়গায় নদীর উঁচু বাঁধে লম্বা ফালির মত জনবসতি হয়েছে। জল ছাড়া মানুষের চলে না, তাই জল থেকে খুব দূরে জনবসতি হয় না ; আবার যেখানে নদীতীরে বন্যার বেশি ভয় থাকে সেখানেও বসতি হয় নি। সরস্বতী এবং অন্যান্য কানা, মজা ও বোঁজা নদীর পরিত্যক্ত নদীখাতের দুপাশের উঁচু আড়ুলি বরাবর এখনও বহু প্রাচীন গ্রাম থেকে গেছে, কিন্তু নদীর জলের অভাবে এগুলি আগেকার সমৃদ্ধি হারিয়েছে। রাস্তাঘাটের সংযোগস্থলেও গ্রামীণ জনবসতি হয়েছে। এই সব গ্রামে চাষবাসের চেয়ে মাল কেনাবেচা এবং কুটিরশিল্পের বেশি গুরুত্ব। অনেক সময় এইসব বর্ধিষ্ণু গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে।

কলকাতা : ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনেই কলকাতা মহানগরীর জন্ম হয়। বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে ১৩০ কি মি উত্তরে হুগলী নদীর উঁচু পাড়ে কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি এই তিনটি গ্রাম কোম্পানি ইজারা নেয়। ক্রমে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়। কলকাতা বন্দর ছাড়াও গড়ে ওঠে ফোর্ট উইলিয়াম। কলকাতা ভারতের রাজধানী হয়। কলকাতার কাছে ১৮১৮ সালে ভারতের প্রথম কাপড়ের কল এবং ১৮৫৪ সালে পাটকল স্থাপন করে আধুনিক শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। সেই থেকে বাড়তে বাড়তে

৭৮টি শহর নিয়ে কলকাতা নগরপুঞ্জের বর্তমান আয়তন হয়েছে ১,০৪০ বর্গ কি মি. এবং লোকসংখ্যা ৭১ লক্ষ।

সুন্দরবন অঞ্চল

অবস্থান : হুগলী নদীর মোহনার বাঁদিকে বাংলাদেশ পর্যন্ত ২৪-পরগণা জেলার ১৫টি থানায় বর্তমান সুন্দরবন এলাকা ব্যাপ্ত। একসময় এই সমগ্র অঞ্চলটিতে সুন্দরী গাছের বন ছিল। সেই থেকে সুন্দরবন নাম হয়েছে। এখন শুধু দক্ষিণপ্রান্তেই সেই বনভূমির কিছুটা অবশিষ্ট আছে (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। সুন্দরবনের মোট আয়তন ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার, তার মধ্যে ৪,২৬৩ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি।



ভূ-প্রকৃতি : এই স্থলভাগ একসময় সমুদ্রমগ্ন ছিল। তখন সেই অগভীর সমুদ্রে গঙ্গার পলি স্তরে স্তরে জমে বদ্বীপ তৈরি হচ্ছিল। কয়েক হাজার বছর আগে সমুদ্রের জল এখান থেকে নেমে যায় ও তার ফলে সুন্দরবন অঞ্চল স্থলভাগ হিসাবে দেখা দেয়। এখন সুন্দরবনে নদী ও সমুদ্র এক সঙ্গে মাটি ঢেলে সেই অকালে ভূমিষ্ঠ এবং অসম্পূর্ণ বদ্বীপকে সম্পূর্ণ করছে। গঙ্গার দক্ষিণবাহী শাখাগুলি যেমন নদীখাতে ও মোহনার আশেপাশে পলি ফেলছে তেমনি জোয়ারের টানে সমুদ্রের তলানি উঠে এসে এখানকার নিচু জায়গাগুলি ক্রমশঃ ভরাট করছে। কিন্তু মানুষ ক্রমাগত বাঁধ দিয়ে প্রকৃতির এই স্বাভাবিক বদ্বীপ গঠনের কাজে বাধা দিচ্ছে।

ছোট বড় বহু দ্বীপ নিয়ে সুন্দরবন। এখানে একে জমির ঢাল অতি সামান্য তার উপরে একদিকে উত্তর থেকে গঙ্গার শাখানদী ও প্রচুর



বৃষ্টির জল নামে, অন্যদিকে দক্ষিণ থেকে সমুদ্রের জোয়ারের জল ওঠে। দুইয়ে মিলে এখানে অসংখ্য খাল, খাড়ি, জলের সৃষ্টি করে।

নদনদী, খাড়ি ও জলাভূমি : সুন্দরবনে মাকড়সার জালের মত গঙ্গার শাখানদীগুলি ছড়িয়ে গেছে। ইছামতী, মাতলা, পিয়ালী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি বড় শাখানদীগুলিরও উত্তর দিক চড়া পড়ে মজে যাচ্ছে। মজা নদীগুলির নদী খাতে সারি সারি ঝিল, ঝাঁওড়, ঘোগ্ বা জলাভূমি থেকে গেছে। মাঝে মাঝে পাতরি দিয়ে ঘিরে ডোবাজমিকে মানুষ আবাদে পরিণত করছে। জঙ্গল কেটে ও জমিতে চুন দিয়ে নুন কাটিয়ে আবাদে চাষবাস হয়। অনেক সময় বাঁধ ভেঙে গেলে আবাদ জলমগ্ন হয়ে যায়। শাখানদীগুলির উপরের দিক মজে গেলেও, দক্ষিণ থেকে সমুদ্রের জোয়ারের জল খাড়িগুলিকে সজীব রেখেছে। হুগলীর মোহনা সবচেয়ে চওড়া ও প্রাণবন্ত। হুগলীর পূর্বে সপ্তমুখী, মাতলা, গোসাবা, হরিভাঙ্গা প্রভৃতি খাড়িও খুব প্রশস্ত, এপার ওপার দেখা যায় না। কিন্তু এগুলি খুবই অগভীর, ভাটা পড়লে স্টীমারও ঢুকতে পারে না।

মাটি : সুন্দরবনের মাটি অত্যন্ত লোনা, অনুর্বর এবং কাদাটে। নদীর চরে ও পাড়ে সাদা বালি দেখা যায়। ফ্রেজারগঞ্জেও সামুদ্রিক বালি দেখা যায়। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে গাছপালা পচে সুন্দরবনের মাটির রঙ কালো হয়ে গেছে। রোদে এই মাটি যখন ফেটে যায় তখন ফাটলের ধারে সাদা নুনের রেখা পড়ে। মাটি এলোমেলো ভাবে ফাটে না। প্রত্যেকটি ফাটল কালো মাটির বুকে সাদা রেখা টেনে ছয় কোনা ষড়-ভুজের আকার নেয়!

জলহাওয়া : সুন্দরবনের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র এবং সমুদ্র সান্নিধ্যের জন্য শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার খুব একটা পার্থক্য হয় না। সুন্দরবনে বাড়িঘর তৈরি করতে যে সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হয় তার থেকে এখানকার বাতাসের প্রকৃতি ধরা পড়ে : 'দক্ষিণে ফাঁক, উত্তরে বাগ; পূর্বে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।' শীত ছাড়া এখানে সর্বদা দখিনা সমুদ্রবায়ু

বয়। শুধু রাত্রে উত্তুরে হাওয়া চলে। তাই ঠাণ্ডা হাওয়া আসার জন্য বাড়ির দক্ষিণ দিকে ফাঁকা থাকে, লোনা হাওয়ার সোজাসুজি সংস্পর্শ থেকে বাঁচাবার জন্যে ভিটের পেছনে (উত্তর পশ্চিম কোণে) বাঁশবনে ঘেরা বাগান ও আবাদী জমি আর পূর্বে নিত্য প্রয়োজনীয় স্বাদু জলের ডোবা থাকে যেখানে হাঁস চরে। এখানে উত্তর পশ্চিম থেকে যত কালবৈশাখী ঝড়জল হয়, দক্ষিণ থেকে ঘূর্ণিঝড় তার চেয়ে অনেক বেশি হয়। জঙ্গলের মধ্যে ভ্যাপসা অস্বাস্থ্যকর গরম আবহাওয়া থাকে।

জোয়ার ভাটা : এখানে সমুদ্রের কাছে ছোট বদ্বীপগুলি রোজ ১২ ঘণ্টা জোয়ারের জলে ডুবে থাকে। জোয়ার ভাটায় বড় বড় খাড়ির মুখে রোজ ৩ ৪ মানুষ সমান জল বাড়ে কমে এবং চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ভয়ঙ্কর বান ডাকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : নোনা মাটি, উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং জোয়ার-ভাটার প্রভাবে এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই নিত্য জলমগ্ন বনভূমিতে কেওড়া, সুন্দরী, গরাণ, গেওয়া, গর্জন ইত্যাদি গাছ জন্মায়। এ গাছগুলির শিকড় দীর্ঘ। সে কারণে এরা আলগা কাদার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কেওড়া গাছের শিকড় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে কাণ্ডকে খুঁটির মত ধরে রাখে। জলে ডুবে যাতে দমবন্ধ না হয় তার জন্যে সুন্দরী গাছের শিকড় বা 'শূল' মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠে আসে নিঃশ্বাস নিতে। আর জলের তলায় পাছে চারাগাছ পচে যায় তার জন্যে সুন্দরী গাছের বীজ প্রায় ১ হাত লম্বা হয় এবং যথা সময়ে মাটিতে লম্বাভাবে পড়ে গেঁথে যায়। সেই খাড়া উঁচু বীজ থেকে চারাগাছ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে জলের উপরে মাথা তোলে। সুন্দরী গাছের লাল ও শক্ত কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র, নানান খেলনা ও সুচারু দ্রব্য তৈরি হয়। গরাণ ও গেওয়া কাঠও নৌকো, আসবাবপত্র,

দেশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদিতে লাগতে পারে, কিন্তু বর্তমানে এগুলি জ্বালানী হিসাবেই বেশি ব্যবহৃত হয়। বচ, ওড়াধান, গোলপাতা ও হোগলার বনও স্থানে স্থানে সারিবদ্ধ ভাবে দেখা যায়। তাছাড়া সুন্দর-বনে নানা জাতের বাঁশেরও সন্ধান মেলে। গোলপাতা দিয়ে ঘর ছাওয়া এবং হোগলা দিয়ে বেড়া ও চাটাই তৈরি হয়। নোনা মাটি ও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে যেমন ছোট ছোট গাছের জঙ্গল হয়েছে তেমনি উপকূলে হেণ্ডাল, নারিকেল ও সুপারী গাছও প্রচুর হয়েছে।

বন্য প্রাণী : জলে কুমির ও ডাঙায় বাঘের জন্য সুন্দরবন বিখ্যাত। এখানকার রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিশ্বজোড়া খ্যাতি। হরিণ, সজারু, বনবিড়াল, শিয়াল, চিল, বক ও বিষধর সাপেরও অভাব নেই। এখানকার অভয়ারণ্যে বন্য প্রাণীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : জলপথই এখানকার যোগাযোগের প্রধান উপায়। কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপের মধ্য দিয়ে বা ক্যানিং থেকে গোসাবা হয়ে বাংলাদেশে যাবার পথ দুটি প্রধান। এই জলপথ দিয়ে বাংলাদেশ হয়ে আসামেও যাওয়া যায়। স্বাধীনতালাভের আগে এটি ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলপথ ছিল। জলা জায়গায় স্বভাবতঃই উঁচু বাঁধের উপর খুব খরচা করে রাস্তা তৈরি করতে হয়। অসংখ্য নদীনালাকে সেতু বেঁধে অতিক্রম করতে হয়। সেইজন্য এখানে রেলপথ বা সড়ক তেমন বিস্তৃত হতে পারে নি। সাগর দ্বীপে প্রতি বছর বিরাট মেলা হয়। সেই মেলায় তীর্থযাত্রীরা সাধারণত স্টীমারে চড়ে আসে।

খনিজ সম্পদ : সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানিং ও তার আশেপাশে পেট্রোলিয়ম বা খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। উপযুক্ত কলাকৌশল জানা নেই বলে এ তেল এখনও মানুষের ভোগে আসেনি। একই

কারণে এখানকার কালো বেদে মাটি বা পিট জাতীয় নিকৃষ্ট কয়লাও জ্বালানী হিসাবে কাজে লাগে নি।

জীবনধারা : সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে মধু, মোম ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। বিপদসঙ্কুল অরণ্যে আদিম উপায়ে এই কাজ হয় বলে সংগ্রহের পরিমাণ খুবই কম। এই অরণ্যের কাঠও শহরাঞ্চলে নৌকোয় করে রপ্তানী হয়। 'বাদা' বা বন কেটে যে আবাদ তৈরি হয়েছে তার পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ একর ; সেখানে প্রায় ৮৯% এলাকায় আমন চাষ হয়। লোনা জমিতে পাট একদম হয় না। সম্প্রতি এখানে তুলো এবং তৈলগর্ভ-সূর্যমুখী ফুলের চাষ শুরু হয়েছে। নানান শাকশবজীর চাষ এবং হাঁস-মুরগী পালনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার কারণ, কলকাতার বাজারে এগুলির খুব চাহিদা আছে। এখানকার নদী ও খাড়িতে জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে জেলেরা জাল ফেলে। তখন জোয়ারের টানে ভেসে আসা ভেটকী, ইলিশ, গল্‌দা-চিংড়ি বাটা, পার্শে ও তোপসে প্রভৃতি (নোনা জলের) মাছের ঝাঁক ধরা পড়ে। বাঁধে ঘেরা ভেড়ীতে নানান (স্বাদু জলের) ধরনের চারামাছেরও চাষ হয়। অনেক সময় জোয়ারের জলে ভেসে আসা মাছের ঝাঁককে ভেড়ীর একদিক খুলে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। এই ধরনের ভেড়ীকে 'বাসা বাধা' বলে। সুন্দরবন থেকে কাঁকড়া ও কচ্ছপও কলকাতার বাজারে আসে। সম্প্রতি ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালিতে সৈকতাবাস হওয়ায় সেখানকার লোকেদের আয় বেড়েছে।

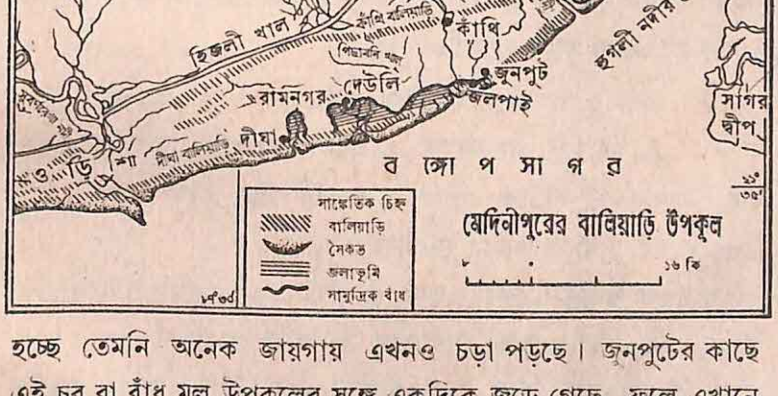
জনবসতি : প্রকৃতিকে বশ মানিয়ে সুন্দরবনকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য হ্যামিল্‌টন্ সাহেবের নাম অমর হয়ে থাকবে। ইনি গোসাবায় একটি সমৃদ্ধ আবাদের পত্তন করেন। এখনও সুন্দরবনের অরণ্য জনহীন কিন্তু আবাদে জনবসতি হয়েছে। এরা অনেকেই দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে। সুন্দরবনের বনভূমিতে লোক

বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক থেকে দুই জনের মধ্যে। থানা সদর ও রাস্তার সংযোগস্থলে জনবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। ক্যানিং এবং জয়নগর মজিলপুর শহরে ৩৪ হাজারেরও বেশি এবং টাকিতে ২১ হাজারেরও বেশি লোক বাস করে।

মেদিনীপুরের বালিয়াড়ি উপকূল এলাকা

অবস্থান : হুগলী নদীর মোহনার ডানদিকে মেদিনীপুরের উপকূলভূমি। এখানে দীঘা, রামনগর, কাঁথী ও খেজুরি থানার দক্ষিণে এবং পূর্বে রসুলপুরের নদী থেকে ওড়িশা অবধি সরু ফালির মত একটি অংশে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি বালিয়াড়ি। এলাকাটি খুব ছোট কিন্তু বিচিত্র।

ভু-প্রকৃতি : নদীর বালি ও কাদা, সমুদ্রস্রোত ও সমুদ্রবায়ু একযোগে এলাকাটি সৃষ্টি করেছে। এই জায়গাটি একসময় সমুদ্রে ডুবে ছিল। তখন সুবর্ণরেখা ও অন্যান্য নদীর মাটি জমে সেই অগভীর সমুদ্রে বাঁধের মত লম্বা চড়া পড়েছিল। সমুদ্র হঠাৎ সরে যাওয়াতে ঐ সব চড়া এখন বালিয়াড়িরূপে দেখা দিয়েছে। সমুদ্রস্রোতে যেমন দীঘা উপকূলের ক্ষয়



হচ্ছে তেমনি অনেক জায়গায় এখনও চড়া পড়ছে। জুনপুটের কাছে এই চর বা বাঁধ মূল উপকূলের সঙ্গে একদিকে জুড়ে গেছে, ফলে এখানে

একটা হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। এরকম আটকে পড়া লোনা জলাভূমি এখানে আরও আছে। ভাটা পড়লে চরগুলি জল থেকে মাথা তোলে। তখন চর থেকে বাতাসে বালি উড়ে এসে উপকূলে জমা হয়। এইভাবে এখনও ঐ বালিয়াড়ি উপকূল ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে বেড়ে চলেছে। দীঘার সৈকতভূমি বেশ চওড়া এবং সমতল। এখানে এরোপ্লেনও নামতে পারে।

নদী ও জলাভূমি : সুন্দরবন উপকূলের সঙ্গে এখানকার তফাৎ এই যে এখানে নদী-নালার বদলে চোখে পড়ে সৈকতভূমি, সারি সারি ২০ মিটার উঁচু তট সমান্তরাল বালিয়াড়ি এবং বালিয়াড়ির মধ্যে মধ্যে লোনা জলাভূমি। তট থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে কাঁথীর বালিয়াড়িটি সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত রসুলপুরের নদী এখানকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য নদী। নদীটিতে বর্ষার জল ছাড়াও জোয়ারের জলও ঢোকে। জুনপুটের সুন্দর উপহ্রদের পোশাকী নাক 'লেগুন'।

জলহাওয়া : এখানে শীতকালে সমুদ্রের গরম হাওয়া আর গরমকালে সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। ফলে কখনই বেশি শীত বা গরম লাগে না। কিন্তু এখানে খুব ঝড় বৃষ্টি হয় এবং বেশ ভ্যাপসা গরম পড়ে। ঘূর্ণিঝড়ে ও সমুদ্রের লোনা জলে বহু ক্ষতিও হয়।

মাটি : এখানকার মাটিতে সামুদ্রিক বালি ও নুন স্বভাবতঃই বেশি। বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী সমভূমিতে বালিচাপা নোনা এঁটেল মাটি দেখা যায়। এখানকার মাটিকে এককথায় অনুর্বর বেলে-এঁটেল বলা চলে। উপকূলে বহু জায়গায় ভয়ঙ্কর চোরাবালি আছে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : কেয়া, ফার্ন ও কাঁটাগুল্ম এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ। ছাড়া ছাড়া তাল, নারকোল ও কাজু বাদামের গাছও দেখা যায়। গ্রামগুলিকে ঘিরে রাখে বাঁশবন এবং নিম, পিপুল প্রভৃতি

ছায়াতরু। দীঘাতে ক্যাসুরিনা ঝাউ গাছের কৃত্রিম বন আছে। বেলে-মাটিতে তরমুজ জাতীয় গাছ ভাল জন্মায়।

খনিজ সম্পদ : বালি ছাড়া এখানে আর কোনও খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় না। তবে সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরি করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। রামনগর থানায় নুন তৈরির কারখানা আছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : এই উপকূলের একেবারে উত্তর সীমায় রয়েছে হিজলী খাল। এই খালটি এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে কোনও রেলপথ নেই। খড়্গপুর ও কাঁথী থেকে দীঘা এবং জুনপুটে যাওয়ার পাকা রাস্তা হয়েছে। দাঁতন থেকে দীঘা অবধি রেলপথ করারও কথা হচ্ছে।

জীবনধারা : এখানকার অধিকাংশ লোকই জেলে এবং চাষী। এখানকার উপকূলে প্রচুর গলদা চিংড়ি পাওয়া যায়। জুনপুটে সরকারী তত্ত্বাবধানে শুঁটকী মাছ, মাছের সার এবং হাঙরের তেল তৈরি হয়। উপকূল থেকে দূরে, বালিয়াড়ির পাদদেশে, বাঁধ বা জাঙাল দিয়ে নোনা জল আটকে আমন ধানের চাষ হয়। এখন তাইচুং ধানও হচ্ছে।

জনবসতি : এই এলাকাটিকে জনবিরল বলা চলে। ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট গ্রামেই বেশি লোক থাকে। দীঘাতে সৈকতাবাস হওয়ার জন্য জনবসতি বেশি। মিষ্টি জলের অভাব এবং জমির অনুর্বরতা এখানকার জনবিরলতার প্রধান কারণ।

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়? উন্নয়ন মানে শ্রীবৃদ্ধি। শ্রীবৃদ্ধি হয় সম্পদ থেকে। অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধিকেই উন্নয়ন বলে।

সম্পদ কী? যেসব জিনিষের বা পরিশ্রমের মূল্য আছে তাকেই সম্পদ বলে। জমিজমা, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, জামাকাপড় ইত্যাদি মানুষের নিজস্ব **ব্যক্তিগত সম্পদ**। মজুর বেগার খাটে না, সেজন্য শ্রমও মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি হচ্ছে **সামাজিক সম্পদ**, যদিও ওগুলোকে ঠিক বেচা কেনার জিনিস বলা চলে না। তবে এক হিসাবে ওগুলো অন্যান্য আর্থিক সামগ্রীর মতই, কারণ চিকিৎসক, শিক্ষক সবাই পয়সা নিয়ে তবে চিকিৎসা করেন, শিক্ষা দেন : সেবা বিক্রী করে তাঁদের আয় হয়।

দেশের সম্পদ কারো নিজস্ব নয়। সমাজের সকলের জন্য। বনজ, খনিজ ইত্যাদি **প্রাকৃতিক সম্পদ** বা রাস্তাঘাট, রেলপথ, সেচখাল, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি **সাংস্কৃতিক সম্পদ** দেশের সবাই সমষ্টিগতভাবে ভোগ করে। দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ **মানুষ**। দেশটা যদি শরীর হয় তো মানুষ তার মন, প্রাণ এবং আত্মা। সেজন্য **মানুষের মঙ্গলই দেশোন্নয়নের চরম লক্ষ্য**।

সম্পদ গুণের দিক থেকেও বাড়তে পারে, পরিমাণের দিক থেকেও বাড়তে পারে। ধনী হতে গেলে যেমন আয়ের পরিমাণ বাড়াতে হয় তেমনি সভ্য হতে গেলে শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রেম ইত্যাদি

গুণ অর্জন করতে হয়। যে দেশে মানুষ যত অর্থশালী এবং সভ্য সেই দেশ তত উন্নত।

পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়? দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য আমরা খুব ভেবেচিন্তে, হিসেব করে এবং গুছিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত করি এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজকর্ম করি তাকেই পরিকল্পনা বলা হয়। মানুষ স্বর্গরাজ্যে বাস করে না। চাইলেই সবকিছু পাওয়া যায় না। সেজন্য মানুষ কি চায় এবং কেমন করে তা পাবে এই দুটি প্রশ্নের সমাধান করার জন্যেই পরিকল্পনা করতে হয়।

মানুষের **চাওয়ার শেষ নেই,** কিন্তু **পাওয়ার সীমা আছে**। আমরা যত পাই তত চাই আর সব কিছুর বেশি পেলে খুশী হই। যেমন, হঠাৎ ছুটি পেলে তোমরা খুশী হও। কিন্তু প্রশ্ন, কেমন করে পাওয়া যায়? কোথায় কতটা পাওয়া যায়? একটা জিনিস খুব বেশি পেলে আর একটা জিনিস কম পড়বে না তো? যেমন ছানা, মাখন ঘি বেশি পেতে গেলে দুধ কম পড়ে, আবার দুধ বেশি পেতে গেলে ওগুলি তৈরি করা যায় না। সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে বেশিটা কিভাবে পাওয়া যাবে? পাওয়ার এই সমস্ত উপায় সন্ধান এবং 'অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা' করার হিসাবই পরিকল্পনার প্রধান **সমস্যা**, আর উপায় নির্ণয় তার **সমাধান**।

সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণের জন্য কি করা দরকার এবং কি উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি হবে তার লক্ষ্য স্থির করাকে বলে **সরকারী পরিকল্পনা নীতি**। এই নীতিকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সরকার যেসব কাজকর্ম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তাকে বলা হয় **রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা**।

লক্ষ্য স্থির করতে গেলেই মাপের কথা ওঠে। জাতীয় পরিকল্পনার

একটা সময়ের মাপ থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পনার যাবতীয় কাজকর্ম শেষ করতে হয়। আমরা ঠিক করেছি ধাপে ধাপে দেশের উন্নতি হবে, প্রতিটি ধাপে উঠতে ৫ বছর করে সময় লাগবে। সেজন্য এই পরিকল্পনাকে **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা** বলে।

পরিকল্পনার অপর গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিটি হল আর্থিক। **সম্পদকে মাপার সবচেয়ে ভাল উপায় আর্থিক মূল্য**। আমরা পার্থিব সব চাওয়া পাওয়ার হিসেব টাকা পয়সা দিয়ে করি। অর্থ ই মানুষের সব পাওয়ার শেষ নয়, ওটি চতুর্বর্গের একটি মাত্র। কিন্তু আমাদের স্বল্পোন্নত দেশে জনসাধারণকে অভাব থেকে মুক্ত করাই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। স্বভাবতঃই আমরা সর্বাগ্রে ভাবি ভাত-কাপড়ের কথা, কি করে মানুষ খেয়ে পরে বাঁচতে পারে, আরও ভাল অবস্থা হলে এটা ওটা নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে। হতে পারে কেউ ক্ষুদ কুঁড়োয় সুখী, কারো বা ঘি-ভাতে অরুচি কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। আমরা অর্থকেই সুখসমৃদ্ধির মাপকাঠি ধরি, ব্যক্তিগত এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্যই **অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা** করি।

বর্ষণপুষ্ট নদী যেমন বিচিত্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সমুদ্রে মেশে তেমনি মানুষের বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ফলে সৃষ্টি হয় **ব্যক্তিগত আয়** আর সমস্ত ব্যক্তিগত আয় মিশে সৃষ্টি হয় **জাতীয় আয়**। সমুদ্রের জল যেমন মেঘ হয়ে ফিরে যায় তেমনি জাতীয় আয়ও আবার জাতির কল্যাণে খরচ করা হয়।

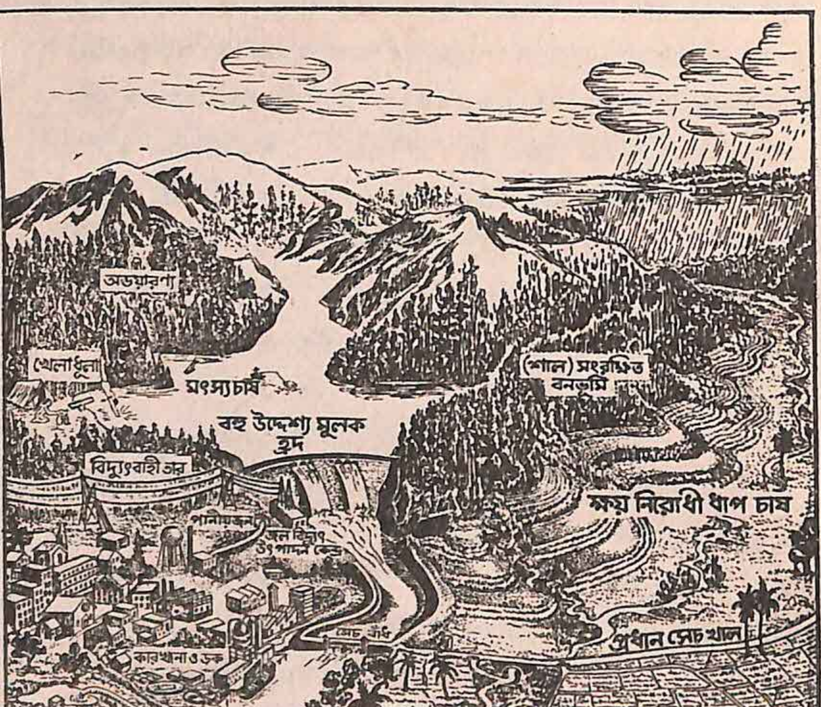
উৎপাদন—আয় সৃষ্টি—ব্যয়—ভোগ ও সঞ্চয়—পুনরুৎপাদন করে দেশের অর্থনীতি ক্রমাগত চাকার মত ঘুরে চলেছে। চাকা ঘোরাতে শক্তি লাগে ; সেই শক্তি যোগায় দেশের সমাজ এবং রাষ্ট্র। দুর্বল সমাজ বা দুর্বল রাষ্ট্র জোরে চাকা ঘোরাতে পারে না বা ভারী বস্তু টানতে পারে

না। সেজন্য সামাজিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন **সামাজিক পরিকল্পনার,** দেশকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন **রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার**। পরাধীন ভারতের জাতীয় আয়ের অনেকটাই চলে যেত ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে। ফলে শক্তির অভাবে ভারত পেছিয়ে পড়ল আর ভারত থেকে অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের চাকা দ্রুত ঘুরে গেল। দেশোন্নয়নের মূল কথা জাতীয় আয়ের সদ্ব্যবহার। সেজন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। **পরিকল্পনার সাফল্য** অনেকটা জাতীয় আয়ের সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পদ্ধতি

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ কিছু কম নেই কিন্তু সমস্যাও অনেক। একদিকে প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে অভাব অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা আছে যা সারা ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলির সমস্যার মত নয়। এই সমস্যা নিয়ে পরে আলোচনা হবে। এই সমস্যাগুলির আঞ্চলিক পার্থক্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য রাজ্যে **রাজ্য পরিকল্পনা** করতে হয়। রাজ্য পরিকল্পনা বৃহত্তর জাতীয়-পরিকল্পনার অঙ্গ কিন্তু রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে হয় **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা**। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা স্বভাবতঃই রাজ্য পরিকল্পনার চেয়ে অনেক বড় হয়। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য দেশের সামগ্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা। রাজ্য পরিকল্পনার লক্ষ্য দেশের আঞ্চলিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা।

তোমরা জান যে মানবজীবনের ভরণ-পোষনের জন্য **বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন যত বাড়ে তত সম্পদ বাড়ে এবং উন্নয়ন হয়**। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি ঘুমিয়ে আছে। যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎশক্তি, পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা উপকরণ বা উৎপাদনের



বহুমুখী নদী প্রকল্প

হাতিয়ার ব্যবহার করে উৎপাদিকা শক্তির ঘুম ভাঙাতে হয়। উৎপাদিকা শক্তি যত বেশি জাগ্রত হয়, অর্থাৎ যত বেশি কাজে লাগে তত বেশি উৎপাদন হয়। যেমন ধরা যাক নদীর কথা। নদী দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। চিত্রে দেখ নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করে সেই জল কত বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ কাজে লাগাতে পারে—সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও জলাভূমি পুনরুদ্ধার, পানীয় জল, জলবিদ্যুৎ, মৎস্য চাষ, জল পরিবহণ ইত্যাদি। একেই বলে বহুমুখী নদী প্রকল্প। বহুমুখী দামোদর প্রকল্প থেকে পশ্চিমবঙ্গের ও বিহারের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। এটা ঠিক পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব রাজ্য পরিকল্পনা নয়, এতে বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকারেরও অংশ আছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে।

উৎপাদনের উপকরণ থাকলেই উৎপাদন হয় না। কারখানা ভর্তি কল মেশিন, কিন্তু একটিও শ্রমিক নেই, এরকম ভূতুড়ে কারখানায় কোন পণ্য উৎপন্ন হয় না। আবার কলকব্জা নেই, উৎপাদন ও শ্রমকৌশল জানা নেই, কেবল শ্রমিক আছে, এ অবস্থায় খুব সামান্য পণ্য উৎপাদন হবে। শ্রম আর ধন মিলে সমাজের পণ্য উৎপন্ন হয়; সে পণ্য বাঁটোয়ারা হয় মজুরি ও মুনাফা হিসাবে ; আর মজুরি ও মুনাফা যোগ দিলেই পাই সমাজের আয়। আবার খরচের দিক থেকে এই আয় কেউ ভোগ করছে, কেউ সঞ্চয় করছে ; আবার যা সঞ্চয় হচ্ছে তাই দিয়েই ধনবৃদ্ধি হচ্ছে। অর্থাৎ, সমাজের আয় হয় ভোজ্য দ্রব্যে, নয় ধন দ্রব্যে, খরচ হচ্ছে। উৎপাদন বাড়াতে গেলে ধন দ্রব্যে বেশি খরচা করতে হয়, নিত্য নতুন কলকারখানা, রাস্তাঘাট, যানবাহন ইত্যাদি তৈরি করতে হয়। কিন্তু আমাদের গরীব দেশের জনসাধারণ যা আয় করে তার প্রায় সবটাই ভোজ্য দ্রব্যে খরচা করে ফেলে—সঞ্চয় করার মত উদ্বৃত্ত তো থাকেই না বরং তারা কায়ক্লেশে মহাজনের কাছে ক্রমাগত ধার করে বেঁচে থাকে।

শ্রম + ধন = পণ্য = মজুরি + মুনাফা = সমাজের আয় ; অথবা ব্যয়ের দিক থেকে ভোজ্য দ্রব্য + ধন দ্রব্য = মোট পণ্য = সমাজের আয়।

উপরের হিসাবটি সমাজের **আর্থিক চিত্র**। পরিকল্পনার লক্ষ্য সমাজের আর্থিক বৃদ্ধি। সমাজের **পণ্য শ্রম ও ধন নির্ভর। সুতরাং শ্রম ও ধনের বাড় হলেই সমাজের আয় বাড়ে**। যদি জনসংখ্যা বেশি বেড়ে গিয়ে শ্রমের বাড় ধনের বাড়ের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে পণ্য বাড়বে বটে কিন্তু অল্প হারে বাড়বে, কারণ শ্রমিকের মাথা পিছু ধন দ্রব্য কমে যাবে। সেজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিকল্পনাকারীদের কাছে একটি বড় সমস্যা। এর সমাধান হয় যদি **ধনবৃদ্ধির হার শ্রমবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়, যাতে শ্রমিকের রোজগার বাড়বে, সঞ্চয় বাড়বে এবং সেই সঞ্চয় ধনবৃদ্ধির সহায়ক হবে**। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য উভয় পরিকল্পনারই লক্ষ্য আয় ও সঞ্চয়ের হার বাড়িয়ে দেশের ধনবৃদ্ধি দ্রুততর করা।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে উৎপাদন খুব তাড়াতাড়ি বাড়ানো যায়। সেজন্য একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো এবং অন্যদিকে আধুনিক পন্থায় উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। মানুষের শ্রমদক্ষতা উৎপাদিকা শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শ্রমদক্ষ গুণী মানুষ তৈরির জন্য প্রয়োজন শিক্ষার, বিশেষতঃ শিল্পকৌশল শিক্ষার। সেজন্য শিক্ষাখাতে পরিকল্পনার অনেক অর্থ ব্যয় হয়। তাপশক্তির উৎপাদক হিসাবেই কয়লা একসময় সকলের কাছে পরিচিত ছিল। ক্রমে মানুষ কয়লার তাপশক্তিকে বাষ্পশক্তিতে এবং তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করল। তাতে হল না—কয়লা দিয়ে লোহা ও ইস্পাত তৈরি করে, গ্যাস, নানা ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ, সার ও বহু প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে আমরা কয়লা থেকে যে ধন সৃষ্টি করছি ২০০ বছর

আগে তা কল্পনাও করা যেত না। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা পরিকল্পনার একটা বিশেষ লক্ষ্য।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তি বিশেষ, গোষ্ঠী বিশেষ বা দেশের সম্পত্তি হিসাবে থাকে। যখন উৎপাদনের উপকরণের উপর সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই জনগণের ব্যাপক অংশকে শোষণ করার সুযোগ ঘটে—দেখা দেয় দাস-প্রথা, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র। যে দেশে উৎপাদনের উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা থাকে সে দেশকে **সমাজতান্ত্রিক দেশ** বলে। সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র দুটি ব্যবস্থারই দোষ ও গুণ আছে। উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশে এই দুটি ব্যবস্থাই চালু রাখা হয়েছে। একে বলা হয় **মিশ্র অর্থব্যবস্থা**। এই ব্যবস্থায় একদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদ্যোগ এবং অপরদিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পাশাপাশি অবস্থান করে।

পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থান

সাধারণ এবং গতানুগতিকভাবে রাষ্ট্রের শাসন ও সংরক্ষণের জন্য যে ব্যয় হয় তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকে দ্রুত কার্যকরী করতে। আমাদের গরীব দেশে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থসংস্থান একটি বিশেষ সমস্যা। কতটা অর্থ সংগ্রহ করা যাবে তার উপরই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও মাত্রা স্থির হয়। অর্থ সংগ্রহের প্রধান সূত্রগুলি হল ১. কর রাজস্ব, ২. দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, ৩. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মুনাফা, ৪. বৈদেশিক সাহায্য এবং ৫. ঘাটতি-ব্যয়। ঘাটতি-ব্যয়ও একরকমের ঋণ। সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ নেন এবং সে ঋণের প্রায় সবটাই আসে অতিরিক্ত নোট বা টাকা ছেপে। ঘাটতি ব্যয় পূরণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের।

পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য সরকার যে সমস্ত করের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ১. ভূমি রাজস্ব, ২. বিক্রয়-কর, ৩. কৃষি-আয়কর, ৪. মাদকদ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক, ৫. বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় এবং ব্যবহারের উপর কর, ৬. মোটর গাড়ির উপর কর, ৭. সিনেমা ও অন্যান্য প্রমোদ অনুষ্ঠানের উপর কর, ৮. সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রি করার জন্য স্টাম্প। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজস্ব সংগ্রহ করেন তার একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলি পেয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ হিসাবেও পশ্চিমবঙ্গকে অর্থ সাহায্য করে আসছেন।

বাজেটের তথ্য ও তত্ত্ব

অর্থসংস্থানই শেষ কথা নয়, কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কোন খাতে কতটা অর্থ খরচ হবে তার হিসাবও অনেক তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে করতে হয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থসংস্থান ও ব্যয়বরাদ্দের হিসাবকে **পরিকল্পনার বাজেট** বলে। তত্ত্বের প্রয়োজন হয় ভবিষ্যৎ দর্শনের জন্য। তথ্য থেকে কেবল যা ঘটেছে তাই পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে তোমরা যা জেনেছ তা ভৌগোলিক তথ্য। যা ঘটবে তার তথ্য নেই। অতীত গোণার জন্য তথ্য, ভবিষ্যৎ গোণার জন্য তত্ত্ব। আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে, মুনাফা বাড়লে ধননিয়োগ বাড়ে, এগুলি হচ্ছে তত্ত্ব। শিল্পকুশলতা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনের ব্যয় কমে কিন্তু সম্পদের পরিমাণ ও গুণ বাড়ে—এটিও একটি তত্ত্ব। পরিকল্পনার রূপ বোঝার জন্য এ পর্যন্ত তত্ত্ব আলোচনা হল, এবার তথ্যের আলোচনা হবে।

জাতীয় পরিকল্পনার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

পরাধীন ভারতে আয়বৃদ্ধির কোনও নির্দিষ্ট বা ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু তাই বলে যে সম্পদ বৃদ্ধি হয় নি তা নয়—কলকাতা

বন্দর ও শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল, রেলপথ ও বিমান পথে দেশের দূরতম প্রান্তের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছিল, চা, পাট ইত্যাদি বাণিজ্য শস্যের উৎপাদন শুরু হয়েছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়েছিল এবং সমগ্র দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক তথ্য একটা স্বদেশচেতনার জন্ম দিয়েছিল। স্বাভাবিক কারণে দেশের আর্থিক বৃদ্ধিও হয়েছিল। বহুকাল ধরে যেমন দেশের জনসংখ্যা বেড়ে এসেছে তেমনি সবাইকার ব্যক্তিগত আয় ও সঞ্চয় মিলিয়ে মোট জাতীয় আয়ও বেড়েছে ; মূলধন এবং পণ্যের উৎপাদনও বেড়ে চলেছে।

কিন্তু পরাধীন ভারতে সম্পদের শাঁসটা ভোগ করত ব্রিটিশ প্রভু আর খোলাটা পড়ে থাকত ভারতীয় প্রজাদের জন্য। ভারতের নানান ধরনের খনিজ ও কৃষিজ সম্পদ ব্যবহার করে তারা নিজেদের ভোগের জন্য নানান ধরনের ধাতু ও শিল্পদ্রব্য তৈরি করল, গোলাবারুদ তৈরি করে সারা পৃথিবীব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। ভারতের কাঁচামাল ও শিল্পপণ্য বিদেশে বিক্রী করে প্রচুর মুনাফা করল, কিন্তু ভারতবাসীরা লাভের বখরা পেল না। অর্থাৎ, ভারতবাসীর ব্যক্তিগত আয় বা সম্পদ বৃদ্ধি পেলো না। বিদেশী শাসনে ও শোষণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ, কারণ, এখান থেকেই তারা রাজত্ব শুরু করে এবং এখানেই তারা সবচেয়ে বেশি দিন শোষণ করার সুযোগ পায়।

রাজনৈতিক পরাধীনতা ও অর্থ নৈতিক পরাধীনতার মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। প্রথমটির শৃঙ্খল না কাটাতে পারলে দ্বিতীয়টি ক্ষয়রোগের মত ক্রমশঃ দেশকে ধ্বংস করে। এদেশে ইংরেজ শাসন কায়েমের অল্প পরেই (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) ঘটেছিল **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'** আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হয় **'পঞ্চাশের মন্বন্তর'** (১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কম করে ৫০ লক্ষ দরিদ্রজনের অনাহারে মৃত্যু ঘটে। গণমৃত্যুর

চেয়েও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয় কালোবাজারী ও সমাজবিরোধী কার্য-কলাপ এবং হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পঞ্চাশের মন্বন্তর অনাবৃষ্টি বা অজন্মার জন্য হয়নি। অসাধু ব্যবসায়ীরা দেশের লোককে না বেচে কোটি কোটি টাকার খাদ্য-বস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পাচার করেছিল। ইংরেজরা মুদ্রাস্ফীতি করে অর্থাৎ অনেক টাকা ছাপিয়ে ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্রের দাম বাড়াবার সুযোগ দেয়। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়নি; ফলে সাধারণ লোকের অভাব অনটন বেড়ে গেল, অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু তাদের পক্ষে কেনা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। ইংরেজ ও মিত্রশক্তি কলকাতায় যুদ্ধের মূল ঘাঁটি করেছিল, তাই এই দুর্দশার ধকল সবচেয়ে বেশি সইতে হয় বঙ্গজননীকে। গান্ধীজী বলেছিলেন ভারতবর্ষ একটা কারাগার। পঞ্চাশের মন্বন্তরে পশ্চিমবঙ্গ কারাগারের চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক স্থানে পরিণত হয়, কারাগারে অন্ন মিলত কিন্তু বাঙলায় ফেনও মেলেনি। সাম্রাজ্যবাদের যে এদেশে থাকার বিন্দুমাত্র নৈতিক অধিকার নেই, এই দুর্ভিক্ষে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইংরেজরা যখন ভারত ছেড়ে চলে গেল সারা দেশ জুড়ে তখন অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, ব্যাপক অপুষ্টি ও অসুস্থতা, ভয়াবহ অকালমৃত্যুর নারকীয় অবস্থা। অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সব কিছুই অবহেলিত। সেদিন ভারতবর্ষের সারা অঙ্গে বিদেশী শাসনের ক্লেদ ও গ্লানি যেমন ছিল, পাশাপাশি ছিল কোটি কোটি ভারতবাসীর স্বাধীন ও সুখী সমাজ গঠনের স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ সালেই জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা গঠন করেন এবং জওহরলাল নেহরুকে সংস্থার ভার দেন। **সুভাষ ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার জনক, জওহরলাল কর্ণধার।**

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যার জটিলতা ও তার সমাধান

১. দেশভাগ : স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে যত মূল্য দিতে হয়েছে ভারতের অন্য কোনও প্রদেশকে তা দিতে হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার বিষ পান করে বাঙালীকে নীলকণ্ঠ হতে হয়, বঙ্গজননীর অঙ্গচ্ছেদ করে ভারত স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার প্রথম উদ্দীপনা কেটে যেতেই বোঝা গেল যে বাঙলার মাটিতে ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্র, বাঙলার আত্মাবিরোধী, ভূগোলবিরোধী। দেশভাগের যন্ত্রণা থেকে যে কত রকমের এবং কত জটিল সমস্যার উদ্ভব হবে তা পূর্বে জানা ছিল না। রামপাল-চন্দ্রনাথ বাঙালী হিন্দুর বিদেশ হয়ে গেল, গৌড়-মুর্শিদাবাদ হয়ে গেল বাঙালী মুসলমানের বিদেশ। ফলে লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত পরিবার শরণার্থী হয়ে এপারে ওপারে আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে লাগল। দেখা দিল **উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার,** যার জের আজও মেটেনি। **দ্বিতীয়তঃ** দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ হারাল বাঙলার কৃষি-সম্পদ, পূর্ববাঙলা হারাল বাঙলার শিল্প-সম্পদ। পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট পাটের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। তখন পাটের অভাব মেটাতে ধানের বদলে পাট চাষ বাড়াতে হল। ফলে ধানের উৎপাদন কমল। চালের অভাব বিদেশ থেকে গম আমদানী করে মেটাতে হল। পশ্চিমবঙ্গে গম চাষও শুরু হল। গম চাষ বাড়াবার জন্য জলসেচের পরিকল্পনা করে সরকার চাষীকে সাহায্য করছেন। **তৃতীয়তঃ** পূর্ববঙ্গ থেকে মাছ আমদানী বন্ধ হয়ে গেল, ফলে মাছে-ভাতে বাঙালী খুব সংকটে পড়ল। সরকার বাংলাদেশ থেকে মাছ আমদানী করে এই সমস্যা কিছুটা মিটিয়েছেন। **চতুর্থতঃ** দেশভাগের ফলে আসামের ও ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জলপথে যোগাযোগও বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গ ও কলকাতার মধ্যে রেল যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনার শুরুতেই নতুন রেলপথ ও জাতীয় সড়ক তৈরি করে সরকার এই সমস্যার মোকাবিলা করেন। এখন বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করে জলপথে যানচলাচলও আবার শুরু হয়েছে।

২. **জনসমস্যা : অতিজনতা** একটি সর্বভারতীয় সমস্যা ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংকট সবচেয়ে তীব্র। ১৯৭১ সালের গণনা অনুযায়ী এই রাজ্যের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কি মি এবং লোকসংখ্যা ৪৪,৩১২,০১১ ; অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৫০৪। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বেশি, কিন্তু আয়তনও সেই তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় জনবসতির ঘনত্ব অনেক কম—উত্তর-প্রদেশে ৩০০, বিহারে ৩২৪ এবং মহারাষ্ট্রে ১৬৪। পশ্চিমবঙ্গের জন-সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১ সালে মোট জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল ষষ্ঠ। ১৯৬১ সালে হয় পঞ্চম এবং ১৯৭১ সালে চতুর্থ। ১৯৫১ সালে এ রাজ্যের জন-সংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি ৬৩ লক্ষ এবং ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৯৭ জন। **উদ্বাস্তু আগমন** এই বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত প্রায় ৫৮ লক্ষ উদ্বাস্তু এ রাজ্যে এসেছেন এবং কলকাতা শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে, সুন্দরবনে ও উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন করেছেন। জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও নদীয়া জেলায়। ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় **পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুহার অনেক কমে গেছে** বলেই এ রাজ্যের জনসংখ্যা ভারতের অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ব্যতিক্রম এ রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল। সেখানে বাঙালীদের সংখ্যা যত না বেড়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে অবাঙালীদের। পাট শিল্পের ৭৯ শতাংশ, কাগজ শিল্পের ৭৩%, সুতিবস্ত্র ও লোহা-ইস্পাত শিল্পের ৫৪%

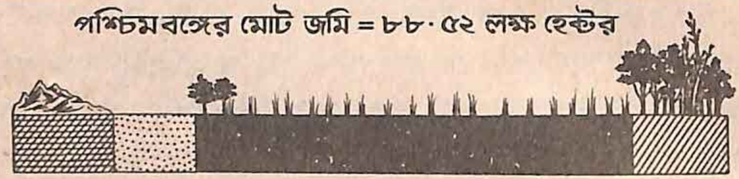
এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ৪৯% কর্মী অন্যান্য রাজ্য থেকে এসেছে। **আগন্তুকদের অবিরাম স্রোত** চা-বাগান ও নতুন শিল্পাঞ্চলের দিকে ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এদের ব্যক্তিগত আয় থেকে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় আয় খুব সামান্যই বৃদ্ধি পায় ; কারণ, এরা রোজগারের প্রায় সব টাকা দেশে পাঠিয়ে দেয়। অর্থাৎ পরাধীন আমলে যেমন ভারতের আয় ব্রিটিশ কোষাগারে যেত, স্বাধীন আমলে তেমনি **পশ্চিমবঙ্গে উপার্জিত টাকা থেকে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।** কেন্দ্রীয় সরকারও এ রাজ্য থেকে বছরে ৯০০ কোটি টাকা আয় করেন। একটা হিসাবে দেখা গেছে যে কলকাতা থেকে ডাকযোগেই বছরে ২৮ কোটি টাকা বাইরে চলে যায়। শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য শহর থেকে ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতির মাধ্যমেও অনেক টাকা এভাবে বাইরে চলে যাচ্ছে। এ অর্থ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থেকে গেলে রাজ্য পরিকল্পনায় ধননিয়োগের পরিমাণ অনেক বাড়ানো যেত।

জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলে পশ্চিমবঙ্গ **বেকার সমস্যায়** জর্জরিত। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই শিক্ষিত বেকারের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। এ রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ২৮ লক্ষেরও বেশি। একমাত্র পরিকল্পনার মাধ্যমেই এদের কর্মসংস্থান সম্ভব। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যাই এই রাজ্যের ছাত্র ও যুব সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আশা না পেলে খুব ন্যায়সঙ্গত কারণেই যুবমনের অসন্তোষ বেপরোয়া বিক্ষোভের রূপ নেয়। কিন্তু এই বিক্ষোভ, বিশেষতঃ পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে খেলার মাঠ পর্যন্ত নৈরাজ্য দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ। সেজন্য ৫ম পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে বেকারদের কর্মসংস্থানের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩. **খাদ্য সমস্যা :** জীবনধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর

তালিকায় খাদ্যের স্থান শীর্ষে। কাজেই নাগরিকদের মধ্যে সুষম খাদ্যবণ্টন কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। অতিজনতার জন্যই এ রাজ্য খাদ্যে স্বনির্ভর নয়। গত তিরিশ বছরে এ রাজ্যে খাদ্যোৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়েছে সেই তুলনায় আরও অনেক বেশি।

সর্বভারতীয় পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে খাদ্যে ঘাটতির খুজন্য পশ্চিমবঙ্গ নিজে ব একটা দায়ী নয়। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়



পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমির পরিমাণ খুব কম এবং কৃষি জমির আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রায় নেই। অতিজনতার জন্য পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু জমির পরিমাণও খুব কম। কৃষি জমির উপর অত্যধিক চাপের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কৃষক জল পেলেই জমি চাষ করে ; অযথা ফেলে রাখে না। উপরে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-ব্যবহারের চিত্রে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ্যা জমি ও বনভূমিও খুব সামান্য। স্বাধীনতার প্রথম বছরে খাদ্য-ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ টন। ১৯৭১ সালের পর থেকে সেই পরিমাণ ২০ লক্ষ টনের উপরে চলে গেছে। অথচ ১৯৪৮-এ যেখানে ধানের ফলন ছিল ৩৩ লক্ষ টন, ১৯৭১এ সেখানে হয় ৬৮ লক্ষ টন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা এত বেড়ে যায় যে প্রয়োজন দাঁড়ায় ৯০ লক্ষ টনের। এ রাজ্যে শুধু উদ্বাস্তুদের জন্য বছরে ১০ লক্ষ টন বাড়তি

খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হচ্ছে। এ রাজ্যে বহিরাগতদের সংখ্যা ৬০ লক্ষেরও বেশি—এদের জন্যও বছরে ১১ লক্ষ টনের খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়।

১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে পাট চাষের পরিমাণ ৮১,০০০ হেক্টর থেকে ৬,০৭,০০০ হেক্টরে সম্প্রসারিত হয়। কাঁচা পাটের অভাব মেটানোর জন্য, জাতীয় স্বার্থে এ রাজ্যে পাট চাষ বাড়াতে হয়। যে বাড়তি ৫,২৬,০০০ হেক্টর জমিতে পাট ও মেস্তার চাষ হয় তাতে অন্তত-পক্ষে ৫ লক্ষ টন চাল পাওয়া যেত। গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে ব্যাপকভাবে পাটচাষ শুরু হয়েছে, ফলে পাটের অভাব অনেকটা মিটেছে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশঃ পাটচাষের পরিমাণ কমিয়ে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পাট থেকে ভারত সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সেজন্য **ধানের বদলে পাট চাষ, অন্যান্য রাজ্য থেকে অভিবাসী (immigrant) আগমন এবং শরণার্থী সমাগম** এই তিনটি বিষয় **সর্বভারতীয় সমস্যা** এবং এর প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমঙ্গকে খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য করেন। পশ্চিমবঙ্গও **সবুজ বিপ্লবের** পরিকল্পনা করে খাদ্যে স্বনির্ভর হবার চেষ্টা করছে।

৪. সামাজিক দুর্নীতি : পশ্চিমবঙ্গের এই **তিনটি মূল সমস্যা—দেশ-ভাগজনিত সমস্যা, জনসমস্যা ও খাদ্যসমস্যা**—থেকে আনুষঙ্গিক অন্যান্য বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। যেমন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা। প্রথমে সামাজিক সমস্যার কথাই ধরা যাক। দেশ-ভাগ বাঙালীর মনেও ভাঙন ধরিয়েছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক অভাবের তাড়নায় এ ভাঙন জোড়া তো লাগলোই না বরং বহু লোকের স্বভাব নষ্ট হয়ে গেল। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, কালোবাজারী ইত্যাদি দেশের উন্নতিশীল অর্থনীতির অন্তরায় হয়ে দেখা দিল। লোভ, স্বার্থপরতা,

প্রভৃতি মানসিক জঞ্জাল দেশাত্মবোধের চেতনাকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিল। জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করার প্রবণতা, যেমন বিজলী তার চুরি, রেলে-বাসে আগুন ধরানো, কর ফাঁকি ইত্যাদি দেশকে ক্ষয়রোগের মত আক্রমণ করেছে। এই অবস্থার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জাপান ও জার্মানির তুলনা করা যেতে পারে। জাপানে অ্যাটম বোমার আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক মারা যায় আর জার্মানি বঙ্গদেশের মত ভাগ হয়ে যায়। এদের কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল; দেশের লোক এক বেলাও পেট ভরে খেতে পেত না। কিন্তু প্রবল স্বদেশপ্রেম, ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এরা ১০ বছরের মধ্যেই দেশকে এমন ভাবে গড়ে তুলল যে আজ বিশ্বের প্রথম সারির উন্নত দেশগুলির সঙ্গে জাপান ও জার্মানি স্থান পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক ও অন্যান্য নানান ধরনের ভেদাভেদ, নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ শক্তি ভারতভূমি ত্যাগ করার আগে ভারতবাসীর একটা বড় অংশের এমন চরিত্র নষ্ট করে দিল যে স্বাধীনতা পেয়েও তারা স্বাধীনতার মূল্য বুঝল না।

৫. **শিক্ষা সমস্যা:** স্বাধীনতার জন্মলগ্নে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আড়াই কোটি লোকের তিন-চতুর্থাংশ ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। এই বিপুল নিরক্ষর জনসমাজের প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তোলা ছিল রাজ্যের অন্যতম প্রধান সমস্যা। আজও এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি। নিচের হিসাব থেকে বোঝা যাবে যে অজ্ঞানতার অন্ধকার সামান্যই দূর হয়েছে। একমাত্র হাওড়া, কলকাতা ও হুগলী জেলায় শতকরা ৪০ জনের বেশি লোক লিখতে পড়তে জানে। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়ায় শত-করা ৮০ ভাগ লোকই অশিক্ষিত। অন্যান্য জেলাগুলিতে শিক্ষিতের হার ২১%থেকে ৩৯%এর মধ্যে। ভারতের সংবিধানে ৬ থেকে ১৪ বৎসর

শিক্ষার স্তর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা		শিক্ষার্থী-সংখ্যা	
	১৯৪৭	১৯৭৩	১৯৪৭	১৯৭৩
প্রাথমিক শিক্ষা	১৩,৯৫০	৩৬,৯৭৯	১০,৪৪, ১১১	৪৩,৫১,০৮৯
মাধ্যমিক শিক্ষা	১,৯০৩	৭,০৪৫	৫,৩২,৫০৭	১৯,২৬,৩৪৯
উচ্চ শিক্ষা (কলেজ)	৫৫	২৫০	৩৬,২৩২	২,৪৭,৬৩

বয়সের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের আবশ্যিক শিক্ষার যে প্রতিশ্রুতি আছে তা পশ্চিমবঙ্গে এখনও পালন করা যায়নি।

উচ্চশিক্ষার প্রসারে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবদান সবচেয়ে বেশি। ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা, বিশ্বভারতী, যাদবপুর, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান ও রবীন্দ্র ভারতী, ৫টি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ২৪টি পলিটেকনিক, ১৯টি টেকনিকাল স্কুল এবং বড় বড় হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি উচ্চশিক্ষার অনেকগুলি কেন্দ্র আছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এগুলি যথেষ্ট নয়। ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া বেশ কঠিন। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের আগ্রহী ছাত্ররাও অনেক সময় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় না।

জনস্বাস্থ্যের সমস্যা: চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়েছে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত, কলেরা ও যক্ষ্মায় লক্ষ লক্ষ লোক অকালে প্রাণ হারাত; আজ সে সব ব্যাধি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত। একসময় ম্যালেরিয়ায় গোটা দেশ ধুঁকত এবং এ-রোগে প্রতি ১ লক্ষ লোকের ৩৬০ জনের মৃত্যু হত, এখন সেই সংখ্যা কমে গিয়ে হয়েছে ১০ লক্ষে মাত্র ১ জন। বসন্ত রোগে এ-রাজ্যে মৃত্যুর হার ছিল লক্ষ পিছু ৫৭ জন, এখন এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০ লক্ষে মাত্র ৩ জন। শুধু মৃত্যুর হার

কমে নি, পশ্চিমবঙ্গবাসীর গড় আয়ুও অনেক বেড়েছে। আগে প্রতি হাজার শিশুর ১০৪ জন মারা যেত চিকিৎসার অভাবে, এখন সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২তে। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাক্তার, নার্স, ধাত্রী, উপযুক্ত পানীয় জলের সরবরাহ ইত্যাদিও অনেক বেড়েছে।

কিন্তু সাফল্যের তুলনায় আমাদের প্রয়োজন এখনও অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলে অগণিত দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের ওষুধ-পথ্য কেনার সামর্থ্য নেই। প্রধানতঃ অর্থাভাবে স্কুল-স্বাস্থ্য আজও অবহেলিত; এবং বিনা-মূল্যে রোগনির্ণয়ের সুযোগ থাকলেও যক্ষ্মার প্রকোপ আজও অনবদমিত। ১৯৭০ সালে এ-রাজ্যে মোট ১০ লক্ষ ৪৩ হাজার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৪০ হাজারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা গিয়েছিল। এর মধ্যে ২৫ শতাংশের কিছু না কিছু অসুখ ছিল, ৩২ শতাংশের ছিল দন্তরোগ এবং ১৬ শতাংশের খাদ্যাভাবজনিত অপুষ্টি। এরাজ্যে ৬৬·৫% মানুষ আজও নিরক্ষর, তারা স্বাস্থ্যরক্ষার অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলি বোঝে না এবং মানতে চায় না। নানারকম সাফল্য সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যের মান এখনও বিশ্বদণ্ডের অনেক নিচে।

তুলনামূলক চিকিৎসার সুযোগ (প্রতি ১ লক্ষ লোকের জন্য)
এবং জন্ম ও মৃত্যুর হার (বছরে প্রতি ১০ হাজার লোক পিছু)

দেশ/রাজ্য	হাসপাতাল বেড	ডাক্তার	নার্স	জন্মহার	মৃত্যুহার
ভারত	৫৩	২১	১০	৩৬৬	১৬০
পশ্চিমবঙ্গ	৮৮	৫৮	১৫	১১৬	৬৫
শ্রীলঙ্কা	৩৩০	২৪	২৯	৩১৮	৭৯
জাপান	১০০০	১১১	২৫০	১৭৮	৬৫
যুক্তরাজ্য	১০০০	২০০	৩৩০	১৭০	১২০

৭. **দারিদ্র্য-সীমা রেখা বা Poverty line :** উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে আমাদের সব সমস্যার মূলে আছে জনগণের দারিদ্র্য। পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের মতে যাদের **মাসিক আয় ৪০ টাকা** বা তারও নিচে তারা দরিদ্র ; অর্থাৎ মাসিক ৪০ টাকার বেশি উপার্জন না করলে দারিদ্র্য সীমার উপরে ওঠা যাবে না। ঐ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সবাই গরীব। আগেই বলেছি মোট আয়ের কিছুটা ব্যক্তি-



গত ভোগে ব্যয় হয়। ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট আয় ছিল ২৩০২ কোটি টাকা ; এর ৭৯% বা ১৮১৯ কোটি টাকা ছিল পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে চার কোটি মানুষের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য। জনসংখ্যা দিয়ে ঐ ১৮১৯ কোটি টাকাকে ভাগ করলে দেখা যাবে যে **পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গড়পড়তা মাথাপিছু আয় ছিল মাসিক ৩৮ টাকা! বছরে মাত্র (৩৮ × ১২) = ৪৫৬ টাকা!**

পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞরা আরও খুঁটিয়ে হিসেব করে দেখেছেন যে এ রাজ্যের সবচেয়ে গরীব শতকরা ১০ ভাগ লোকের মাথাপিছু মাসিক

আয় ১১ টাকারও কম—দৈনিক হিসাবে মাথাপিছু ৩৬ পয়সা, যা দিয়ে ২০০ গ্রাম চালও কেনা যায় না। এভাবে দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের ৭০% লোকের মাথাপিছু দৈনিক ব্যয় ১ টাকা ৩৬ পয়সা (৫ জনের পরিবার পিছু ৬ টাকা ৬০ পয়সা)।

কেন এই দারিদ্র্য ? পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা কি অলস ? উপার্জনে অক্ষম না মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করেও উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না ? পশ্চিমবঙ্গ কি এতই গরীব যে শিশুরাও অর্ধাহারে রাস্তায় পড়ে থাকবে এবং জন্মের ১ বছরের মধ্যেই মারা যাবে ? এই রাজ্য কি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা নয় ?

তোমরা নিশ্চয় তারস্বরে প্রতিবাদ করে বলবে 'না'। কারণ আগের শ্রেণীতে এবং বইয়ের গোড়ার অংশে তোমরা দেখেছ যে পশ্চিমবঙ্গ নানান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। সেজন্য এখানে সম্পদ সম্ভার সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন নেই! এখন আমাদের খুঁজতে হবে ধাঁধার উত্তর। **এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও কেন এই অভাব** তার ঐতিহাসিক কারণ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে আগেই আলোচনা হয়েছে। এই জটিল ধাঁধা থেকে মুক্তির জন্য পরিকল্পনাকারীরা কি পথ নিয়েছেন তাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে।

বিভিন্ন রাজ্য-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলাফল

প্রথম পরিকল্পনা : ১৯৫১, ১লা এপ্রিল থেকে ১ম পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল দুটি—১। যুদ্ধ ও দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ যে দুর্দশায় পড়েছিল তা থেকে মুক্তি ; এবং ২। আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ় করার জন্য কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

এটি ছিল সংকটমুক্তির পরিকল্পনা—ভাঙা ঘর মেরামতের, **আলাদা করে** সংসার পাতার পরিকল্পনা। এই সময় থেকেই **সমবায় প্রথা ও মিশ্র অর্থনীতি** প্রবর্তিত হয়েছিল, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, পাট চাষ অস্বাভাবিক হারে বেড়েছিল, রেলপথ রাস্তার মাধ্যমে বহু বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, কলকাতায় বেসরকারী বাস স‍ম্পূর্ণ তুলে দিয়ে **রাজ্য পরিবহণ সংস্থার** বাস চালু হয়েছিল এবং তাতে শরণার্থীদের কর্মসংস্থান হয়েছিল এবং **দামোদর নদীশাসন** প্রকল্প উন্নয়নের একটা নবদিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা : ১৯৫৬, ১লা এপ্রিল থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনা শুরু হয়। ১ম পরিকল্পনায় যেখানে ধননিয়োগ হয়েছিল ৭২ **কোটি** ২য়



পরিকল্পনায় সেখানে হল **১৫৭ কোটি টাকা। শিল্প ও যানবাহনের খাতে খরচা অনেক বৃদ্ধি পেল।** কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়ে মিলে দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে মৌল শিল্প উৎপাদনের

জন্য অনেক ধননিয়োগ করেন। স্থির হয় যে **শুধু হালকা শিল্পগুলিকে বেসরকারী উদ্যোগে বাড়তে দেওয়া হবে।** ১ম পরিকল্পনায় তাঁত, দেশলাই, লণ্ঠন ইত্যাদি হালকা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল বেশি, **২য় পরিকল্পনায় ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, কোক্ কয়লা** ইত্যাদি **যৌল শিল্পগুলির লক্ষ্য হল** বেশি। **সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কার** এই সময় থেকেই শুরু হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনায় যতটা উন্নয়নের লক্ষ্য ছিল তা পূরণ হয় নি, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বেকার সমস্যা তীব্র হয়েছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনা : ১৯৬১, ১লা এপ্রিল ৩য় পরিকল্পনা শুরু হয়। তখন পশ্চিমবঙ্গে দারুণ খাদ্য সংকট। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্থিক মাপের দিক থেকে ৩য় পরিকল্পনা আগেরটির মতই উচ্চাভিলাষী ছিল। তবে উদ্দেশ্য বদলে ছিল। পরিকল্পনাকাকারীরা বুঝেছিলেন যে **উন্নয়নের পদক্ষেপ দ্রুততর করতে হলে আগে আমাদের পেছিয়ে পড়া বন্ধ করতে হবে, নইলে এগিয়ে যাবার প্রয়াস ব্যর্থ হবে।** সেজন্য তৃতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশকে **আত্মনির্ভরশীল** করে তোলা এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং শিল্পোৎপাদন ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি এই পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পেয়েছিল। এই পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করা যায়নি এবং জাতীয় আয়-বৃদ্ধির অপেক্ষা জনবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় অনেক কমে যায়, বেকার সমস্যা বাড়ে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তবে **রেল-পথের বৈদ্যুতিকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য।** এই পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য পরিকল্পনা

বিশেষজ্ঞদের দোষ দেওয়া যায় না। ক্রমাগত অনাবৃষ্টির ফলে কৃষিজ উৎপাদন কমে গিয়েছিল। আবার চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলেও অর্থ নৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল।

পরিকল্পনায় সাময়িক বিরতি : তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হবার তিন বছর পরে ১৯৬৯ সালে ১লা এপ্রিল চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু হয়। এই তিন বছরকে প্ল্যান হলিডে বা **পরিকল্পনা থেকে সাময়িক বিরতি** বলা হয়। উন্নয়নের কাজ এই তিন বছর একেবারে বন্ধ হয় নি কিন্তু অর্থের অভাবে ও বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের জন্য উন্নয়নের গতি খুব কমে যায়।

চতুর্থ পরিকল্পনা : পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ পরিকল্পনা ছিল মাত্র ৩২২ কোটি টাকার স্বল্পায়তন পরিকল্পনা—তৃতীয় পরিকল্পনার চেয়ে মাত্র ১৭ কোটি টাকা বেশি। তুলনা করলে দেখা যায় যে মহারাষ্ট্রের তৃতীয় পরিকল্পনা ছিল ৪২৩ কোটি টাকার আর চতুর্থ ৮৯৮ কোটি টাকার—দ্বিগুণের বেশি। এত অল্প অর্থ বিনিয়োগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বেড়ে যায় এবং আর্থিক বৃদ্ধি কমে যায়। পরিকল্পনার ব্যয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে দেখা যাবে যে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে যেখানে সর্বভারতীয় গড় মাথাপিছু খরচ হয়েছিল ১২৩ টাকা পশ্চিমবঙ্গে সেখানে হয় মাত্র ৭৯ টাকা—**ভারতের মধ্যে সবচেয়ে কম মূলধন বিনিয়োগ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে**। অনেকে ভাবেন পশ্চিমবঙ্গের মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা নেই। এটা ভুল ধারণা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বছরে নানান কর ও শুল্ক বাবদ ৬০০ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ৩০০ কোটি টাকা—মোট ৯০০ কোটি টাকা আয় করেন। রাজ্য সরকারও তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় যত অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন তা লক্ষ্য ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ যখন এত অর্থ জাতীয় ভাণ্ডারে দিতে পারে তখন তার বৃহদায়তন পরিকল্পনা কেন হবে না?

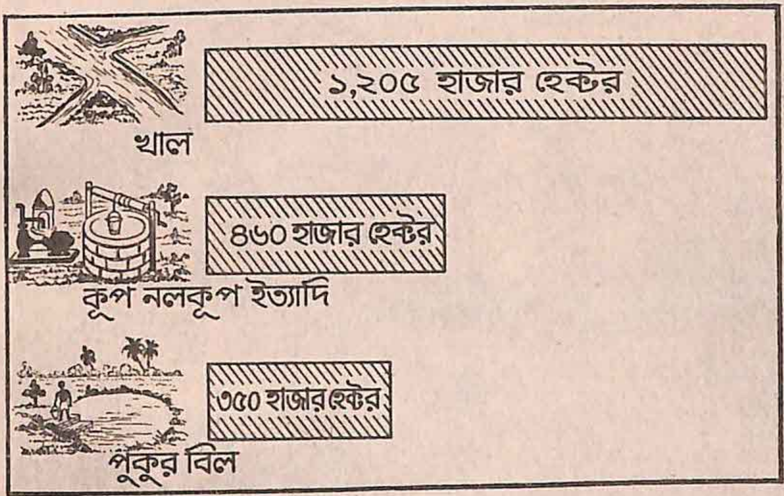
এর একটা উত্তর প্রশাসনিক ব্যর্থতা। দেখা গেছে যে রাজ্য পরিকল্পনাগুলি যত্নের সঙ্গে রূপায়িত হয় নি—কাগজে কলমে যে পরিকল্পনা রচনা করা হত তা বিভিন্ন সরকারী বিভাগের ব্যয়-প্রস্তাব মাত্র। এই দায়-সারা মনোভাব পরিকল্পনার উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়। রাজ্যের সম্পদ ও উৎপাদন সামর্থ্যের পূর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় নিরিখে ঐসব রাজ্য পরিকল্পনা আদৌ তৈরি হয়নি। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি কাটানোর জন্য সম্প্রতি একটি রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে। এই পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গের ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করেছেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

পশ্চিবঙ্গের উন্নয়ন ও সেচ-ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্ব : পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৭০টি লোক আজ যে দারিদ্র্য-সীমার নিচে পড়ে আছে তাদের শতকরা ৯০ জন গ্রামবাসী। এদের উপকার হয় যদি সব মাঠে সারা বছর চাষের ব্যবস্থা করা যায়। জল ছাড়া চাষ হয় না। সুতরাং সারা বছর চাষ করতে হলে আকাশের জল, নিয়ন্ত্রিত নদীর জল, খাল বিলের জল, মাটির নিচের জল—সব জলকে সব জমিতে নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহারে আনতে হবে। শুধু বর্ষার বৃষ্টির উপর নির্ভর করে থাকলে সারা বছর মাঠে ফসল ফলানো যাবে না। কারণ **বর্ষা খুবই অনিশ্চিত** এবং বছরে একবারই হয়। কোনও বছরে যেখানে অতিবৃষ্টি পরের বছরেই সেখানে অনাবৃষ্টি হতে পারে। কোথাও বর্ষা দীর্ঘস্থায়ী কোথাও ক্ষণস্থায়ী। কোথাও খরায় শস্য নষ্ট হয়, কোথাও প্লাবনে নষ্ট হয়। এসব কারণে পশ্চিমবঙ্গে জলের প্রাচুর্য থাকলেও নিয়ন্ত্রিতভাবে জলসেচের প্রয়োজন আছে। আগেই বলেছি পশ্চিমবঙ্গে জমির তুলনায় লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ খুব কম। সেজন্য এ রাজ্য

খাদ্যে স্বনির্ভর নয়। সুতরাং একই জমিতে বছরে ৩/৪ বার ফসল তুলে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এবং তার জন্য উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হবে।

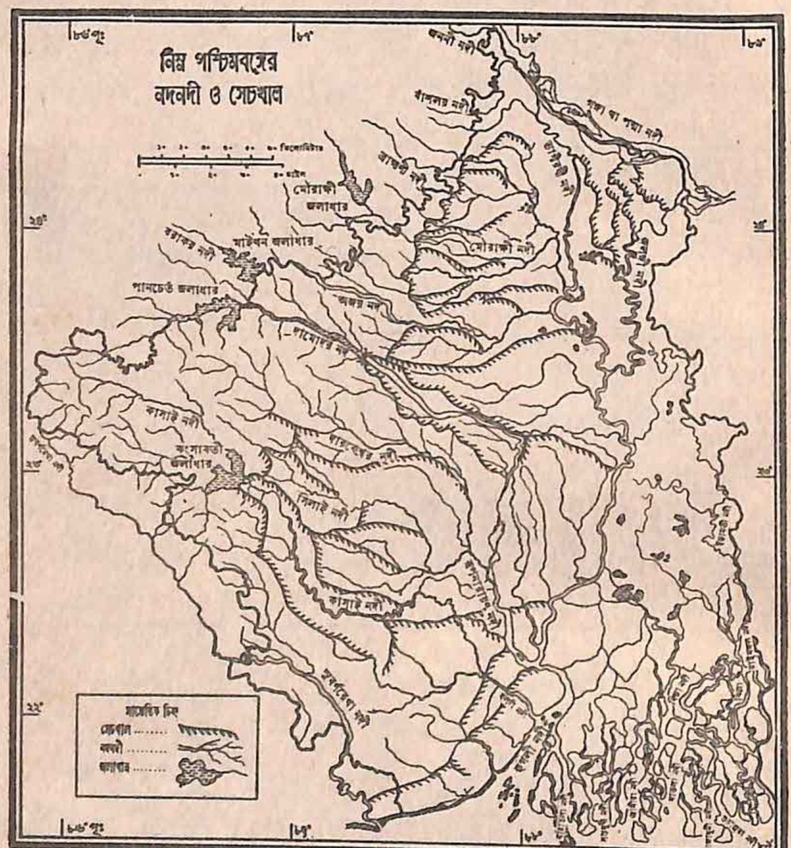
পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বহু পুরাতন সেচ ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য **মেদিনীপুর খাল, ইডেন খাল, দামোদর খাল,** এবং বর্ধমানে পুকুর থেকে সেচ। স্বাধীনতালাভের আগে এ রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার হেক্টর জমিতে খালসেচ হত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়নের



ফলে ১৯৭২-৭৩ সালে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার হেক্টর জমি সরকারী সেচখালের জল পায়। বে-সরকারী উদ্যোগে নানান **মাঝারি** বা **ছোট সেচ-প্রকল্প** (যথা গভীর ও অগভীর নলকূপ, পুকুর, ছোট খাল ইত্যাদি) আরও ৮ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের জল দিচ্ছে। সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী উপত্যকায় খালসেচ ও বিভিন্ন স্থানে ১৪৭টি বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলকূপ (১৯৭২-৭৩)।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে **কংসাবতী** প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এটি বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার ৯.৯ লক্ষ একর রুক্ষ জমিকে সজীব করবে।

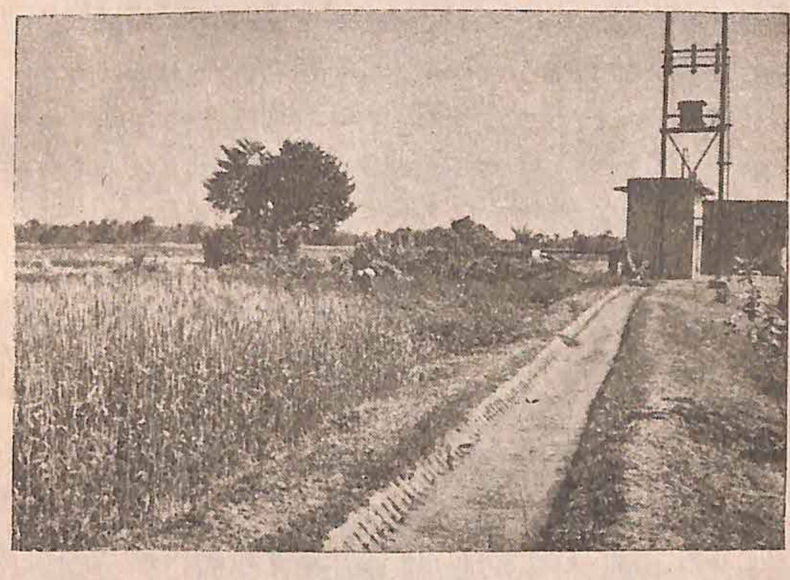
ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের কাজ প্রথম পরিকল্পনাকালে শুরু হয়। ময়ূরাক্ষী



নদীতে বিহারে মসাঞ্জোর বা **কানাডা** বাঁধ এবং সিউড়ির কাছে

তিলপাড়া জলাধার তৈরি হয়েছে। এগুলি থেকে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় ৫·৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হচ্ছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রকল্পে বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকারেরও অংশ আছে। দামোদর ও তার উপনদীগুলির উপর বাঁধ তৈরির কাজ প্রথম পরিকল্পনাকালেই শেষ হয়। এগুলির মধ্যে দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে দুটি প্রধান খাল বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলী জেলায় (দামোদরের প্রাচীন ও পরিত্যক্ত খাতগুলির মধ্য দিয়ে) প্রায় ৮৭ লক্ষ একর জমিতে জল দিচ্ছে।



গভীর বৈদ্যুতিক নলকূপের সাহায্যে জলসেচ

মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে মেদিনীপুর খাল ১ লক্ষ একর, জলপাইগুড়ির করতোয়া, ১২ হাজার একর, বাঁকুড়ার শুভঙ্কর দাঁড়া,

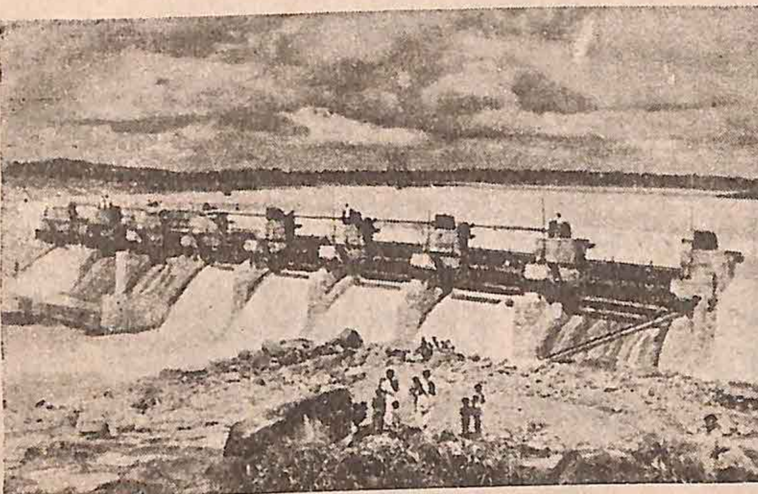
৬ হাজার একর জমিকে সজীব করেছে। পুরুলিয়ার সাহারাজোড় এবং বীরভূমের হিংলো সেচ প্রকল্পের কাজ এখনও চলছে। এই সমস্ত সেচ-প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গের কম বৃষ্টিপাতযুক্ত পশ্চিম অংশে রূপায়িত হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় উত্তরবঙ্গের অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলেও তিস্তা ও মহানন্দার জল দিয়ে খালসেচ শুরু হবে। এখানে সছিদ্র মাটিতে জল দাঁড়ায় না, চুঁইয়ে নেমে যায়। সেজন্য বেশি বৃষ্টি সত্ত্বেও জলসেচের প্রয়োজন হয়।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জমি থেকে অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন নদী-শাসন প্রকল্পগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে আগেই বলেছি। উত্তরবঙ্গে যে কারণে বন্যা হয় মালভূমিপ্রান্তে বা মুর্শিদাবাদ-নদীয়াতে সে কারণে বন্যা হয় না। কিন্তু বন্যার জল জমে থাকলে সর্বত্রই জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। অর্থাৎ, **বন্যার ক্ষতি সাময়িক নয়, সুদূরপ্রসারী**। বন্যার জল জমে থাকলে কালা-জ্বর, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ মহামারীর আকারে দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলনিকাশ ব্যবস্থার কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। সেজন্য বন্যার ক্ষয়পূরণ বাবদ সরকারকে প্রতি বছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে।

প্রথম চারটি পরিকল্পনায় মাত্র ৪৮০ কি মি-র মত বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে ২৫টি শহর সমেত প্রায় ৪·৯ লক্ষ একর জমি বন্যার কবল থেকে বেঁচেছে। আরও ৪০০ কি মি-র মত জমিদারদের তৈরি নিচু বাঁধকে উঁচু করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে চতুর্থ পরি-

কল্পনায় যে কাজ শুরু হয়েছে তাতে উত্তরবঙ্গে ও ফরাক্কার আশেপাশে অনেক জমি জলমগ্ন হওয়া থেকে বাঁচবে। নিম্ন দামোদর উপত্যকায়



কংসাবতী বাঁধ

১৫৫০ বর্গ কি মি, কেলেঘাই প্রকল্পে ১৩০০ বর্গ কি মি এবং মহানন্দা প্রকল্পে ৬০০ বর্গ কি মি এলাকাও বন্যার হাত থেকে বাঁচবে।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

আগেই বলেছি যে কলকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে ব্রিটিশ আমলেই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু করে। দেশভাগের ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দেশের রেল-যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উপরন্তু, সীমান্ত-রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তার প্রয়োজনে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে মনোযোগী হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতা লাভের পরই অতি দ্রুত **আসাম-লিঙ্ক** রেলপথ তৈরি করে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ

পুনর্বহাল করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কলকাতা শিল্পাঞ্চলে দ্রুতগামী **বৈদ্যুতিক ট্রেন** চলতে শুরু করে। ১৯৪৭-এর আগে **জাতীয় সড়ক** ছিল ৬৫৬ কি মি, এখন হয়েছে ১৫৮২ কিমি। এই জাতীয় সড়কগুলি হল :

১। কলকাতা ও দিল্লীর মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বা জাতীয় সড়ক নং ২ ; ২। কলকাতা-বোম্বাই ও কলকাতা-মাদ্রাজের মধ্যে জাতীয়



সড়ক নং ৬ ; ৩। বিহার ও আসামের মধ্যে (ডালখোলা-শিলিগুড়ি ও কোচবিহারের উপর দিয়ে) জাতীয় সড়ক নং ৩১ ; ৪। শিলিগুড়ি

থেকে সেবক হয়ে গ্যাঙটক পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নং ৩১A ; ৫। কলকাতা ও শিলিগুড়ির মধ্যে (ফরাক্কা সেতুর উপর দিয়ে) জাতীয় সড়ক নং ৩৪ ; ৬। কলকাতা থেকে বারাসাতের উপর দিয়ে বনগাঁ পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নং ৩৫ ; ৭। কোলাঘাটে ৬ নং জাতীয় সড়ক থেকে হলদিয়া বন্দর পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নং ৪১।

রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টাতেও রাস্তাঘাট যথেষ্ট বেড়েছে। ১৯৪৭-এর আগে গাঁয়ের কোনও রাস্তাই পাকা ছিল না, আজ ১১,৩৩৯ কি মি দীর্ঘ গ্রাম-রাস্তার প্রায় সবটাই পাকা, জেলা সড়ক ছিল মাত্র ১৪০ কি মি ; এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২,৯৯৪ কি মি, রাজ্য সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ১৬০ কি মি, আজ সেখানে ২,৩৩৪ কি মি দীর্ঘ রাজ্য সড়ক পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা সদরকে স্পর্শ করছে।

পশ্চিমবঙ্গে রাস্তা তৈরির জন্য খরচ বেশি পড়ে। তার কারণ, ১। বেশি নদীনালা থাকায় এখানে বেশি সেতু বাঁধতে হয় এবং নিম্নভূমিতে উঁচু বাঁধের উপর রাস্তা তৈরি করে রাস্তাকে জলমগ্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হয় ; ২। এখানকার নরম ভিজে মাটিকে ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য শক্ত করতে সময় ও শ্রম বেশি লাগে এবং ৩। একমাত্র হিমালয় ও মালভূমি বাদে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পাথরকুচি, সিমেণ্ট প্রভৃতি রাস্তা তৈরির উপকরণ দুর্মূল্য। এসব কারণে রাস্তা সংরক্ষণের ব্যয়ও বেশি পড়ে। এজন্য চতুর্থ পরিকল্পনাকালে যখন পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রাসংকট দেখা দিল তখন রাস্তা তৈরির কাজ প্রায় থেমে গেল। চতুর্থ পরিকল্পনায় বহু রাস্তা ও সেতু নির্মাণের কাজ অর্থাভাবের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত ২৫ বছরে যে সমস্ত **সেতু** তৈরি হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জলপাইগুড়ির কাছে তিস্তা সেতু, মাদারীহাটে তোরসা সেতু,

শিলিগুড়িতে মহানন্দা সেতু, বহরমপুরে ভাগীরথী সেতু, ফারাক্কা সেতু, বীরভূমে ময়ূরাক্ষী সেতু, দুর্গাপুর সেতু, নদীয়ার চূর্ণী সেতু, ২৪ পরগণার ইছামতী সেতু, দামোদর সেতু, রূপনারায়ণ সেতু এবং মেদিনীপুরে কংসাবতী সেতু। কলকাতায় দ্বিতীয় হুগলী সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

কলকাতা নগরপুঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা (সি. এম. ডি. এ.)-র তত্ত্বাবধানে কলকাতার অনেক রাস্তা ৪র্থ পরিকল্পনাকাল থেকে চওড়া করা হচ্ছে। এ ছাড়াও তৈরি হয়েছে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে, ব্যারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়ে। কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতায় পাতাল-রেলপথ তৈরি করতে শুরু করেছেন।

১৯৪৭ এর আগে পথপরিবহণ ছিল মূলতঃ বেসরকারী পরিচালনাধীন। ১৯৪৮–এ **কলকাতা রাজ্য পরিবহণ**, ১৯৫০–এ **উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ** এবং ১৯৬৩তে **দুর্গাপুর রাজ্য পরিবহণ** সংস্থা সরকারী পরিচালনায় কাজ শুরু করে। কলকাতায় ৩য় পরিকল্পনাকাল থেকে আবার বে-সরকারী বাস চলছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকাল থেকে কলকাতা-দীঘা, কলকাতা-শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি-গৌহাটি প্রভৃতি কয়েকটি **দূরপাল্লার বাস** চলছে। ১৯৬৭ থেকে কলকাতার ট্রামও সরকারী পরিচালনায় চলছে।

দমদম বিমান বন্দর একসময় ভারতের তথা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কর্মব্যস্ত পরিবহণ কেন্দ্র ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে দমদম বিমান বন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়। রাজ্য সরকার ১৯৬৩ সাল থেকে বেহালা **ফ্লাইং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের** পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন। এখান থেকে পাশ করা পাইলটরা খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নদীপথে পরিবহণ দেশভাগের পর খুব অসুবিধায় পড়ে। ১৯৫০-এ জলযান মেরামতের জন্য হুগলীতে একটি ডকইয়ার্ড তৈরি হয়। সেই সঙ্গে একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা হয়। ১৯৬৩-তে আরও উচ্চশিক্ষার জন্যও বিশেষ প্রকল্প চালু হয়। আশা করা যাচ্ছে যে স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে জলপথে আবার ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

ডাক, তার টেলিফোন ও বেতার-এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভারত তথা সারা বিশ্বের যোগাযোগ হয়ে থাকে। প্রতিটি পরিকল্পনাকালে এগুলির সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের বহু দুর্গম স্থানে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

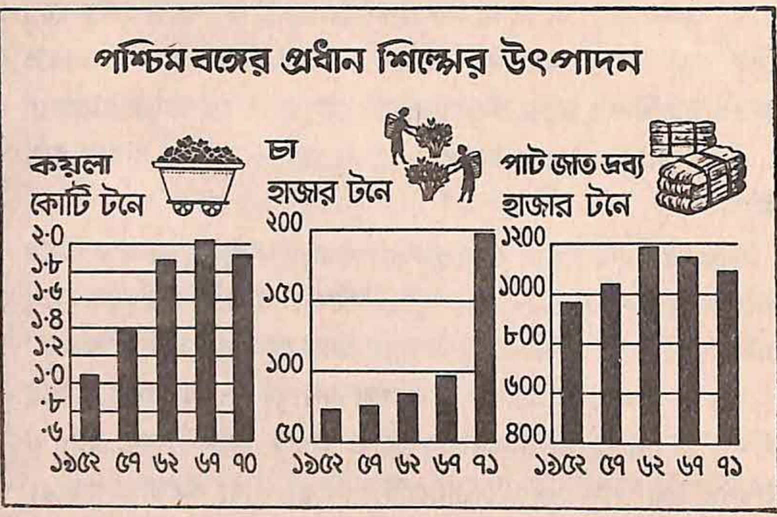
পূর্ব ভারতের অর্থনীতিতে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব সম্বন্ধে আগেই বলেছি। ভারতের প্রায় সমস্ত কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ, লৌহ ও ইস্পাত, চা, পাট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভাগ্য কলকাতা বন্দরের উপর নির্ভর করে। কলকাতা বন্দরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিটি পরিকল্পনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ও শিল্পায়ন

স্বাধীনতার জন্মলগ্নে ভারতের শিল্পপ্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। ভারতবর্ষের শিল্পে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকের এক তৃতীয়াংশের কিছু কম ও কারখানাগুলির এক পঞ্চমাংশ ছিল এই রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে মূল শিল্প ছিল চট, সূতিবস্ত্র, চা, ইস্পাত, কয়লা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। এগুলি ইংরেজ আমলে তৈরি হয়েছিল। সে সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে কাঁচামাল হিসাবে রপ্তানি হয়ে যেত।

স্বাধীনতা লাভের পর স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো দেশের সম্পদ দেশের মধ্যে ব্যবহার করে নতুন শিল্প গড়ে তোলা এবং ক্রমশঃ বিদেশ

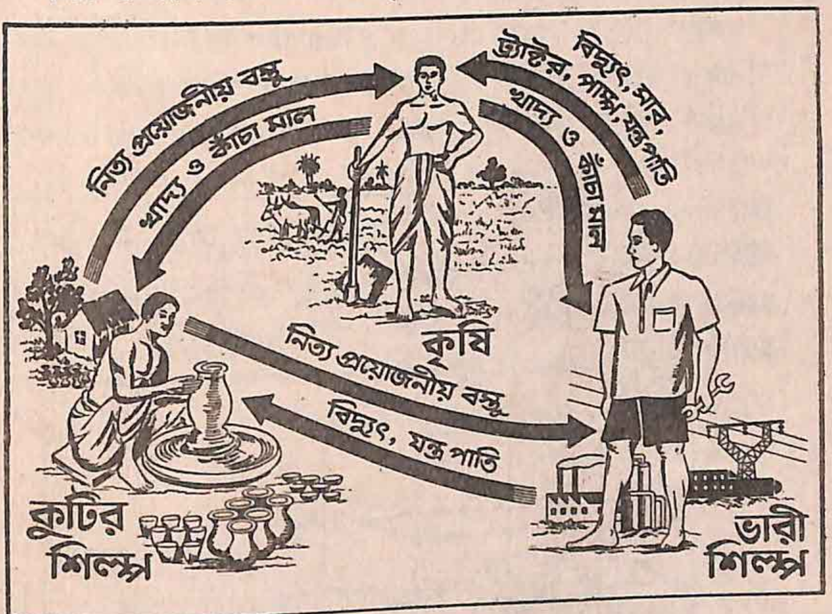
থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি কমিয়ে ফেলা। বিদেশী সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির



শিল্পকে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে কোনও ভূমিকাই নিতে দেয়নি। অথচ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অপরিসীম গুরুত্ব। সেজন্য রাজ্য সরকার এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনেও ব্রতী হয়েছেন। এর শিকড় গ্রামবাংলার কুটিরে কুটিরে, কিন্তু মহীরুহের মত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে নগরে বন্দরে সবাইকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আধুনিক ভারী শিল্পের চাহিদাও মেটাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র-শিল্প।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে **স্বদেশী শিল্পও** গড়ে উঠেছিল। ১৯০৬ সালে ১২ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে শ্রীরামপুরে **বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল** প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বাংলায় ২৮টি মিল ভারতীয় মালিকানায় **সূতীবস্ত্র** উৎপাদন করত। ঐ সময় **হস্তচালিত তাঁত** থেকে ৭ কোটি ৪৭ লক্ষ গজ কাপড় তৈরি

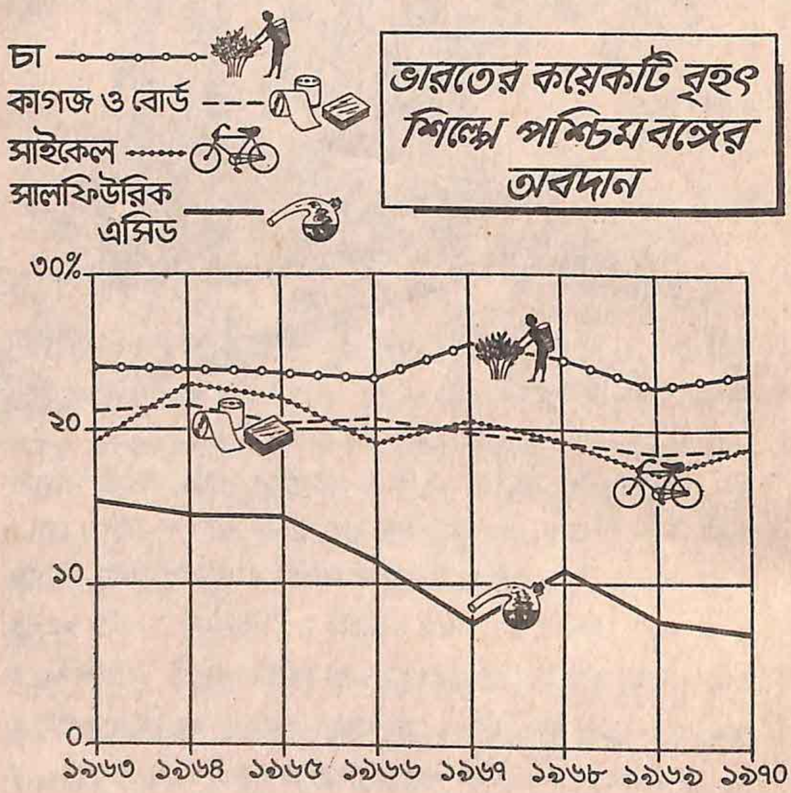
হত। বাংলার ৭ কোটি মানুষের প্রয়োজন স্বদেশী মিল ও তাঁতের কাপড় দিয়ে মেটানো যেত না। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে তাঁতের সংখ্যা ছিল



৪৩ হাজার, এখন হয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার। ভারত সরকার সমবায় প্রথায় যাঁরা তাঁতবস্ত্র উৎপাদন করেন শুধু তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেন। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষতঃ তামিলনাড়ুর তাঁতী, এ সুযোগ যতটা নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তাঁতী ততটা নিতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৯৫০টি তাঁত সমবায় সমিতির মধ্যে মাত্র ৪০০টি সক্রিয় আছে। এগুলি বছরে প্রায় ২০ কোটি গজ কাপড় উৎপাদন করছে। এ ছাড়াও এ রাজ্যে ১৬০০টি বিদ্যুৎ চালিত তাঁত থেকে ৪ কোটি গজ কাপড় তৈরি হয়।

সেই যুগে স্বদেশী মূলধনে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য যে সব শিল্প গড়ে ওঠে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। এটা লক্ষণীয়

যে ভারতীয় শিল্পপতিরা মৌল শিল্পে বেশি মূলধন নিয়োগ করার ঝুঁকি নেননি। আবার বিদেশীরা খাদ্যশিল্প, রেশমশিল্প, চর্মশিল্প, নানান ধরনের কারুকার্য শিল্প, নারকোল ছোবড়াজাত শিল্প বা লাক্ষা শিল্প প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের দিকে মন দেননি। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য খুব তৎপর হয়ে উঠেছেন। এজন্য



রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের কয়েকটি শর্তে অর্থ ও কাঁচামাল ঋণ দেওয়া হচ্ছে, ক্ষুদ্রশিল্পজাত পণ্যের বিক্রয় ও রপ্তানির জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা

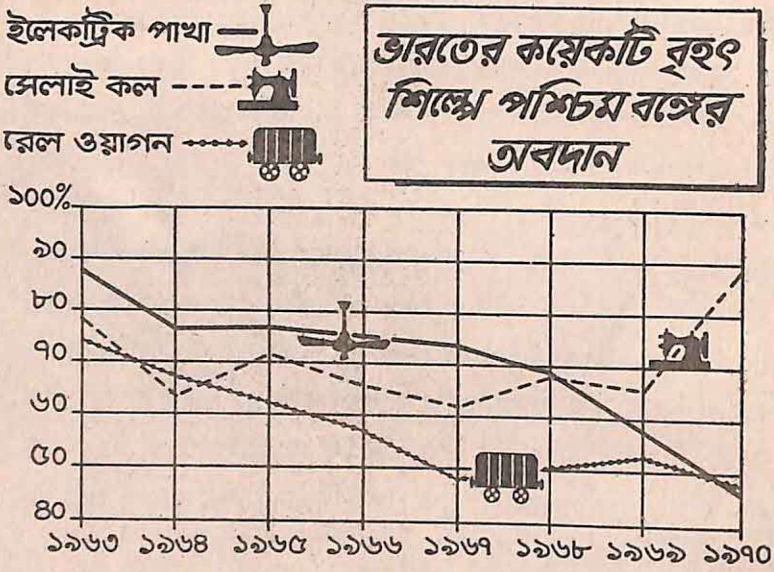
হচ্ছে এবং দুর্গাপুর, কল্যাণী, হলদিয়া, খড়্গপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎ, জল ও অন্যান্য সব রকম সুযোগ সুবিধা সমেত কয়েকটি আদর্শ শিল্প এলাকা তৈরি হয়েছে।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে **রেজেস্ট্রিকৃত কারখানায়** নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬০১৭৭২ জন আর মহারাষ্ট্রে (বোম্বাই) শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৬২৩২০৭ জন। শ্রমিক সংখ্যার দিক থেকে বোম্বাই পশ্চিমবঙ্গের থেকে এগিয়ে থাকলেও শিল্পের মূল্য ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে চটশিল্পে ৩ লক্ষ শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ১ লক্ষ ৭ হাজার শ্রমিক এবং অন্যান্য শিল্পে আরও ২ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ১৯৫১-র পর চটকলগুলিতে শ্রমিক সংখ্যা কমতে থাকে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতি হতে থাকে। ১৯৬৫ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা দাঁড়ায় ৩,২৩৯০০ তে এবং অন্যান্য শিল্পে ২,৯৭,৫০০তে। পাটশিল্পে ঐ সময় মাত্র ২,৫৮,৯০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে **রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে** যে সমস্ত শিল্প এই পরিবর্তনের সূচনা করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা, দুর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, অ্যালয় স্টীল কারখানা, মাইনিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড মেশিনারি কর্পোরেশন, দুর্গাপুর (কোক চুল্লী) প্রোজেক্টস লিমিটেড, অপথালমিক কাচ নির্মাণ কারখানা, সার ও রসায়ন কারখানা, রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্তান কেবল ফ্যাক্টরি এবং যাদবপুরে ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্টস ফ্যাক্টরি। হলদিয়া তৈল শোধনাগার নির্মাণের কাজ এখনও চলছে।

বেসরকারী শিল্পোদ্যোগগুলির মধ্যে হিন্দ মোটরস, দুর্গাপুরে ফিলিপস্ কার্বন ব্ল্যাক, ইণ্ডিয়া ফয়েলস, সূতীবস্ত্র মিল, কেশোরাম রেয়ন, কয়েকটি

প্লাইউড ও কার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরি এবং বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উল্লেখযোগ্য। বড় কারখানাগুলি শ্রমিক নিয়োগ করে



অল্প কিন্তু যন্ত্রপাতি নিয়োগ করে বেশি। ছোট কারখানা অল্প যন্ত্রপাতি দিয়ে চলে কিন্তু শ্রমিক নিয়োগ করে বেশি। ছোট কারখানাগুলি বহু ক্ষেত্রে বড় কারখানার যোগানদার হিসাবে কাজ করে। যেমন হাওড়ার ছোট কারখানাগুলি রেল ওয়াগন ও কামরার ছোট ছোট অংশ তৈরি করে খড়্গপুর, জামালপুর, পেরাম্বুর প্রভৃতি বড় কারখানায় পাঠায়।

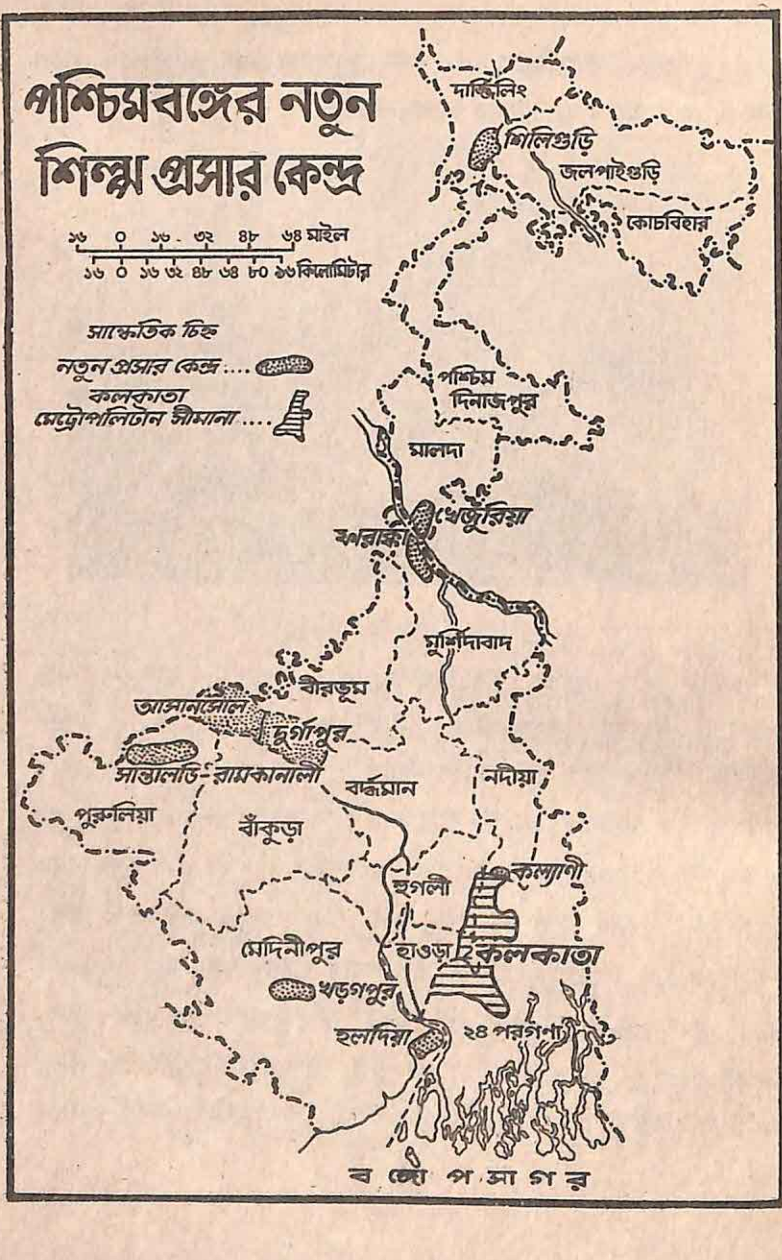
তৃতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে রাজ্য সরকার কলকাতা শিল্পাঞ্চলের উপর চাপ কমাবার জন্য খড়্গপুর, হলদিয়া, কল্যাণী, সান্তালডি, আসানসোল-দুর্গাপুর, ফারাক্কা ও শিলিগুড়িতে কয়েকটি **আদর্শ শিল্প এলাকা** তৈরি করেন। অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এই সব অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। কল্যাণীতে সরকারী স্পিনিং মিল, পশুখাদ্য মিল এবং

স্কুটার ফ্যাক্টরি, হলদিয়ায় বন্দর, সার কারখানা ও পেট্রো রাসায়নিক শিল্প, দুর্গাপুরে তাপবিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন এবং সান্তালডির তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বহু ক্ষুদ্র শিল্পকে আকর্ষণ করবে।



হলদিয়ার নির্মাণকার্য

১৯৬৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প জগতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। গুরুতর অর্থসংকটের মোকাবিলা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ দেওয়া বন্ধ করে দেন। ফলে অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষতঃ ওয়াগন তৈরি খুব কমে গেল। ১৯৬৬ পর্যন্ত পরপর ৩ বছর বৃষ্টির অভাবে কৃষি উৎপাদনও কমে গেল—সেই সঙ্গে চট, চাল, চিনি, তেল প্রভৃতি কৃষিনির্ভর শিল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হল। খাদ্যোৎপাদন কমে যাওয়ায় খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেল এবং তার ফলে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকেরা মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করল। ১৯৬৯ সালে আবার কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, গ্রামবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে এবং শিল্পপণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১-৫২র তুলনায় ১৯৬৮–


পশ্চিমবঙ্গের নতুন শিল্প প্রসার কেন্দ্র
১৬ ০ ১৬ ৩২ ৪৮ ৬৪ মাইল
১৬ ০ ১৬ ৩২ ৪৮ ৬৪ ৮০ ৯৬ কিলোমিটার
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
নতুন প্রসার কেন্দ্র ....
কলকাতা মেট্রোপলিটান সীমানা ....
দার্জিলিং
শিলিগুড়ি
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
পশ্চিম দিনাজপুর
মালদা
খেজুরিয়া
ফরাক্কা
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
আসানসোল
দুর্গাপুর
সান্তালডি-রামকানালী
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্দ্ধমান
নদীয়া
কল্যাণী
হুগলী
হাওড়া
কলকাতা
মেদিনীপুর
খড়গপুর
হলদিয়া
২৪ পরগণা
ব ঙ্গো প সা গ র

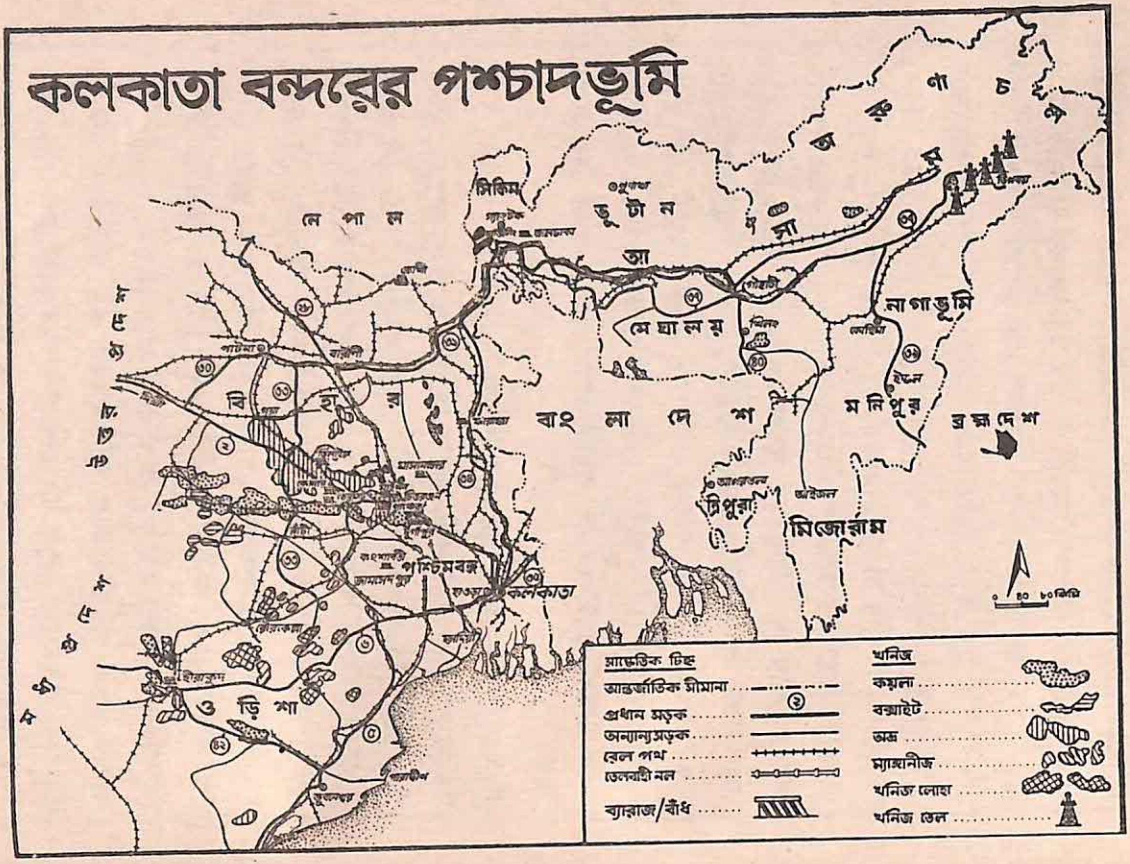
৬৯ সালে আউস ধানের উৎপাদন বাড়ে ২ গুণ, আমন ধানের ১·৫ গুণ, বোরো ধানের ১৩·৯ গুণ, গমের ২ গুণ এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের ১·৯ গুণ। আশা করা যাচ্ছে যে **সবুজ বিপ্লবের** ফলে কৃষকের আয় যত বাড়বে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের ততই উন্নতি হবে। কারণ কৃষক বাড়তি আয় থেকে রাসায়নিক সার, পোকা-মাকড়ের ওষুধ, পাম্প ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র, বিদ্যুৎ, জামা কাপড় ইত্যাদি নানান শিল্পজাত পণ্য কিনবে।

সম্প্রতি বিদ্যুতের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প খুব সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকাল পর্যন্ত এ রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পোৎপাদন প্রায় একই হারে বেড়েছিল, অর্থাৎ বিদ্যুতের অভাব হয়নি। ১৯৬৬ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় বাড়েনি। ঐ সময় শিল্পোৎপাদন খুব কমে যাওয়ায় বিদ্যুৎ-সংকট সাধারণের নজরে আসেনি। সম্প্রতি শিল্পে পুনরুজ্জীবনের সূচনা হতেই বিদ্যুৎ-সংকট খুব প্রকট হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য

পশ্চিমবঙ্গে কয়লা চীনা মাটি, ফায়ার ক্লে প্রভৃতি খনিজ সম্পদ ; বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি বনজ সম্পদ, আখ, পাট প্রভৃতি বাণিজ্য শস্য ; সিঙ্কোনা, চা প্রভৃতি বাগিচা শস্য, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য এবং মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি বাণিজ্যিক উপকরণ হিসাবে ধরা হয়। উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য, শাকসবজিও বাণিজ্যিক উপকরণ। মূল্যের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ উৎপাদন বিদেশে রপ্তানি হয় ; আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের জন্য শুধু ভোগ্যপণ্যই পড়ে থাকে।

ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের এই বহুমুখী বাণিজ্যিক অর্থনীতির উদ্ভব হয়। শুধু বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজনেই যেন শিল্প-পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। রাজ্যের স্থানীয় উৎপাদন রাজ্যের স্থানীয় বাজারে



কলকাতা বন্দরের পশ্চাদভূমি
নেপাল
সিকিম
ভুটান
অরুণাচল
আসাম
নাগাভূমি
মেঘালয়
মনিপুর
ব্রহ্মদেশ
বাংলাদেশ
ত্রিপুরা
মিজোরাম
উত্তর প্রদেশ
বিহার
পশ্চিমবঙ্গ
কলকাতা
ওড়িশা
মধ্যপ্রদেশ
0 40 80 কিমি
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
আন্তর্জাতিক সীমানা
প্রধান সড়ক
অন্যান্য সড়ক
রেল পথ
তেলবাহী নল
ব্যারাজ/বাঁধ
খনিজ
কয়লা
বক্সাইট
অভ্র
ম্যাঙ্গানীজ
খনিজ লোহা
খনিজ তেল

বা সর্বভারতীয় জাতীয় বাজারে যেত না। হয়তো সেই সময়কার যান-বাহন ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য ভারতের বণিকসমাজ বাংলাদেশের পাট ও পাঞ্জাবের তুলা, কিংবা বাংলাদেশের কয়লা ও দক্ষিণ ভারতের ধান বিনিময় করতে পারেনি। এর ফলে আভ্যন্তরিক বাণিজ্য স্থানীয় বাজারের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। বিদেশী বণিকরা কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনে নীল চাষ, পাট চাষ বা চা বাগান তৈরি করে স্থানীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে কোনও অসুবিধায় পড়েনি। এই প্রয়োজন মেটাতেই কলকাতা বন্দরের সৃষ্টি হয়। কলকাতা এখনও ভারতের সবচেয়ে বাণিজ্যপ্রধান শহর। পশ্চিমবঙ্গে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শহর আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কোনও শহরই (বার্নপুর ছাড়া) শুধু শিল্পপণ্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি। পরিকল্পনাকালে তৈরি চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর ও উত্তরপাড়া-হিন্দমোটরস প্রভৃতি শিল্পাশ্রয়ী শহরের পণ্য এখন জাতীয় বাজারে যেতে শুরু করেছে।

ইংরেজরা প্রথমে ভারতীয় পণ্য কিনে বিদেশে বিক্রয় করত; এই ব্যবসায়ে যে লাভ হয় তা থেকে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের মূলধন আসে। শিল্প-বিপ্লবের পর বাণিজ্যের দিক পরিবর্তন হল। ইংলণ্ডের শিল্প-পণ্য কলকাতা বন্দর দিয়ে ভারতে আসতে লাগল, বাংলাদেশের তথা ভারতের শিল্পপণ্যের বাজার নষ্ট হল, বাঙালী কারিগরদের অন্নসংস্থান নষ্ট হল। স্বাধীনতা লাভের পর বিদেশী পণ্য আমদানির উপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে সরকার স্বদেশী শিল্পকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। একদা ভারতে আলপিন্ বা ছুঁচও তৈরি হত না। এখন পশ্চিমবঙ্গে থেকে ভারী যন্ত্রপাতি, ট্রাক, ওয়াগন প্রভৃতিও রপ্তানি হচ্ছে।

বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ভারতের সবচেয়ে শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল কলকাতা

বন্দরকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। রেলপথ, বিমানপথ, ডাক ও তার ইত্যাদি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও বাণিজ্যের প্রয়োজনে কলকাতাকে কেন্দ্র করে পূর্বভারতে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দরকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে কলকাতা বন্দরের পশ্চাদভূমি সবচেয়ে সম্পদশালী ও ঘন বসতিপূর্ণ হওয়ায় কলকাতা সারা ভারতের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান অংশীদার হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতার উপর এই অস্বাভাবিক গুরুত্বের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলগুলি শিল্প-বাণিজ্যে খুবই অনগ্রসর থেকে গেছে। এই অনগ্রসর অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য সরকার শিল্পপতিদের আবেদন জানিয়েছেন। স্থির হয়েছে যে অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্য শুরু করলে সরকার শিল্পপতিদের কাছ থেকে কম শুল্ক নেবেন এবং কাঁচামাল ও অর্থ ঋণ হিসাবে দেবেন। শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে ও স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের জন্যও সরকার সাহায্য করবেন।

আগেই বলেছি কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের পুনর্জীবনের মাধ্যমে রাজ্যের বেশির ভাগ লোকের কল্যাণ সম্ভব। এখন দেখা যাক কোন কোন কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প রাজ্যের কোন কোন জেলায় বাণিজ্যিক উপকরণ হিসাবে বাজারে আসে।

সারণী

পণ্যসম্ভার	উৎপাদন কেন্দ্র ও বাণিজ্য কেন্দ্র
কৃষি যন্ত্রপাতি, ছুরি, কাঁচি, কাঁটা, চামচ, তালা	বাঁকুড়া, বর্ধমান, হাওড়া, পুরুলিয়া
বিড়ি	বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, পঃ দিনাজপুর

পণ্যসম্ভার	উৎপাদন কেন্দ্র ও বাণিজ্য কেন্দ্র
কম্বল	বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ;
কাঁসার ও পিতলের দ্রব্য	বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া।
মৃৎপাত্র ও মাটির পুতুল	বাঁকুড়া, নদীয়া ;
রেশম বস্ত্র, তসর ইত্যাদি	মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া :
নারিকেল ছোবড়াজাত দ্রব্য	হাওড়া
শাঁখের জিনিষ	বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া
সুতিবস্ত্র	সমস্ত জেলায়
গুড়	বর্ধমান, মালদহ, মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা
চামড়ার জিনিস	বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা
মাদুর	বাঁকুড়া, কোচবিহার, মেদিনীপুর ২৪-পরগণা
পাথরের তৈজসপত্র	মেদিনীপুর
বেল মালা	বাঁকুড়া
পশম বস্ত্র	বাঁকুড়া, বর্ধমান, দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ
শোলা	মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, হুগলী, বর্ধমান।

কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান ও পাট পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই কেনা বেচা হয় ; মালদহে আম, দার্জিলিঙে কমলালেবু ও এলাচ, পুরুলিয়ায় লাক্ষা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে চা, জলপাইগুড়ি ও ২৪-পরগণায় কাঠ এবং দার্জিলিঙে পশম উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্ট

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ

একটি গ্লোব বাঁ হাতে ধরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরাও। মনে কর তোমার চোখটা সূর্য। গ্লোবের যে অর্ধেক অংশ তুমি দেখতে পাচ্ছ সেটুকু দিন, বিপরীত দিকে রাত্রি। পৃথিবী ঘুরছে, ক্রমাগত দিন ও রাত্রি হচ্ছে।

প্রশ্ন : কোথায় আগে সূর্যোদয় হয়, কলকাতায় না দিল্লীতে ?—

গ্লোবের গায়ে কতগুলি সরু কালো রেখা লক্ষ কর। উত্তর থেকে বিস্তৃত রেখাগুলিকে **মধ্যরেখা** (Meridians) বলে। গ্লোবের মাঝ বরাবর বিষুব রেখাকে এই মধ্যরেখাগুলি ছেদ করেছে। বিষুব রেখার উপর প্রতিটি মধ্যরেখাকে নম্বর দেওয়া হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সমান্তরাল রেখাগুলিকে **অক্ষরেখা** বলে। ১৮০° মধ্যরেখাকে যেখানে এই অক্ষরেখাগুলি ছেদ করেছে সেখানে এদের নম্বর দেওয়া হয়েছে। বিষুব রেখাকে 0° ধরা হয়।

প্রশ্ন : ১। গ্লোবের উপর কয়টি মধ্যরেখা আছে ?——দুটি মধ্যরেখার মধ্যের অংশ যদি কমলালেবুর কোয়া হয় তাহলে গ্লোবের মধ্য কটি কোয়া আছে ?——২। মূল মধ্যরেখা (0°) কোন কোন দেশের উপর দিয়ে গেছে ?

অক্ষরেখাগুলির মধ্যে বিষুব রেখা সবচেয়ে বড়। যত উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হবে ততই অক্ষরেখাগুলি ছোট হতে থাকে। মধ্য রেখাগুলি কিন্তু প্রত্যেকটি সমান মাপের। মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমের দূরত্বকে দ্রাঘিমাংশ বলে। এই দূরত্ব ডিগ্রী, মিনিট ও সেকেণ্ড

দিয়ে মাপা হয়। একই উপায়ে বিষুব রেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণের দূরত্ব বা **অক্ষাংশ** মাপা হয়।

প্রশ্ন : ১। নিম্নলিখিত স্থানগুলির দ্রাঘিমাংশ কত? কলকাতা—— পুরুলিয়া——সঙ্কোশ নদী——। ২। নিম্নলিখিত স্থানগুলির অক্ষাংশ কত? নতুন দ্বীপ——কলকাতা——বর্ধমান——ফালুত শীর্ষ। ৩। কর্কটক্রান্তি রেখা কত অক্ষাংশ বরাবর টানা হয়েছে?——

বিষুব রেখার উত্তরে সুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত **উত্তর গোলার্ধ** এবং দক্ষিণে কুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত দক্ষিণ গোলার্ধ। মূল মধ্যরেখার পূর্বদিকে ১৮০° পর্যন্ত পূর্ব গোলার্ধ এবং পশ্চিমে ১৮০° পর্যন্ত পশ্চিম গোলার্ধ। পূর্ব ও উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি, দক্ষিণ ও পশ্চিম গোলার্ধে জলভাগ বেশি। ১° অক্ষাংশ = ১১১ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে বিষুব রেখার দূরত্ব কত?——। বিষুব রেখা থেকে উত্তর মেরুর দূরত্ব কত?—

পশ্চিমবঙ্গের জন্মরহস্য : ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস

উত্তরে হিমালয় পাহাড় এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি বাদে পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ অঞ্চলই নতুন পলিতে ঢাকা। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও আরও বহু ছোট নদী পাহাড় ও মালভূমি থেকে নানান জাতের পাথর ভেঙে পলি তৈরি করে বঙ্গদেশের সমতলভূমি গঠন করেছে। সঞ্চিত পলির গঠন সেইজন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের হয়েছে। তিস্তার পলি-কণার আকার ভাগীরথীর পলি-কণার চেয়ে বড়, কারণ তিস্তার খাত বেশি ঢালু, স্রোতবেগও বেশি আবার সুন্দরবনে জোয়ারের টানে মহী-সোপানের সূক্ষ্ম পলি ক্রমাগত জমা হচ্ছে।

এই ভাবে বঙ্গদেশ গড়ে উঠেছে বহু হাজার বছর ধরে। সেই অতীতে সব সময়ে সমুদ্র দীঘা বা গঙ্গাসাগরের কাছে স্থির হয়ে ছিল না। কখনো

বঙ্গদেশের সবটাই সমুদ্রের তলায় ছিল, কখনো ছোটনাগপুরের মালভূমি ও মেঘালয় পাহাড়ের কোল বরাবর ছিল বেলাভূমি। অর্থাৎ, হুগলী বা ভাগীরথী নদী ছিলই না, গঙ্গার মোহনা ছিল বিহার বা উত্তরপ্রদেশে তবে ঐ সময়ে দামোদর নদী বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় বদ্বীপ তৈরি করতে শুরু করেছিল। এক সময় হিমালয় পাহাড়ও সমুদ্রের তলায় ছিল। সেই সমুদ্রের নাম ছিল **টেথিস** আর যেখানে দামোদরের পলি জমছিল সেই সমুদ্রের নাম হয়েছে **দামোদর এম্বেমেন্ট**। বঙ্গদেশের শিলাবিন্যাস থেকে এইসব ইতিহাস উদ্ধার করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভূ-গঠনের ইতিহাসকে মোটামুটি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। ভূত্বক সৃষ্টির আদি পর্বে (**আর্কিয়ান যুগে** ৪০০ কোটি বছর আগে) পুরুলিয়া, পশ্চিম বাঁকুড়া ও পশ্চিম বীরভূম অঞ্চলটি গঠিত হয়। পৃথিবী তখন ছিল সূর্যের মত একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড, আকাশ ছিল ঘন কালো মেঘে ঢাকা। ক্রমে পৃথিবী ঠাণ্ডা হল, আগ্নেয় শিলা জমাটবদ্ধ হয়ে স্থলভাগ গঠন করল। পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে যে আগ্নেয় শিলা দেখা যায় তার উৎপত্তি এইভাবেই হয়েছিল। পরবর্তী যুগে ভূ-আলোড়নের ফলে এই আগ্নেয় শিলা আরও কঠিন রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয়। এই গঠন ও রূপান্তর হতে প্রায় ২০০ কোটি বছর সময় লেগেছিল। পুরুলিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে দলমা পাহাড় ও মালভূমির পশ্চিম প্রান্তে লৌহ আকর সমৃদ্ধ যে সব পাহাড় দেখা যায় তা সব শেষে, অর্থাৎ ২০০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল। তার পর বহু যুগ ধরে মালভূমি ক্ষয় হতে থাকে, বৃষ্টির জল জমে হ্রদ ও সাগরের সৃষ্টি হয়, এমন কি ছোটনাগপুরের মালভূমিও বরফে ঢেকে যায়। মালভূমি প্রান্তে গভীর অরণ্যে জীবজন্তুর আবির্ভাব হয়। দামোদর উপত্যকা বরাবর একটি বিশাল হ্রদে দূরবর্তী অরণ্যের থেকে ভেসে আসা বহু গাছপালার সমাধি

হয়। সেইসব গাছের কাঠ ক্রমে কয়লায় পরিণত হয়। এই কয়লাস্তর সৃষ্টির শুরু ২৭ কোটি বছর আগে এবং শেষ হয় ১৩ কোটি বছর আগে। এই যুগের নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানা যুগ। দামোদর উপত্যকার কয়লাস্তরের মধ্যে যে বেলেপাথর, কাদাপাথর প্রভৃতি পাললিক শিলা দেখা যায় তারও জন্ম ঐ গণ্ডোয়ানা যুগে। গণ্ডোয়ানা যুগেরও আগে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় সমুদ্রের তলায় শামুক জাতীয় প্রাণীর খোল জমে উঠেছিল। এগুলি চুনাপাথরে পরিণত হয়েছে। দামোদর নদী সেই গণ্ডোয়ানা যুগ থেকেই বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলায় বদ্বীপ তৈরি করতে শুরু করে। সেই হিসাবে দামোদর পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম নদী।

গণ্ডোয়ানা যুগের শেষে বীরভূম জেলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চলটি লাভা উদ্গীরণের ফলে সৃষ্টি হয়। আরও পরে, আজ থেকে ৬।৭ কোটি বছর আগে হিমালয় পর্বতের জন্ম হয়। হিমালয়ের চুনাপাথর ও বহু সামুদ্রিক জীবজন্তুর জীবাশ্ম থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হিমালয় একদা সমুদ্রের গর্ভে ছিল। টেথিস সমুদ্রগর্ভে জমা পলির ভারে প্রবল ভূ-আলোড়ন শুরু হয়। মাছ টোপ গিললেই যেমন ফাতনা ডুবে যায় এবং ছিপে সামনের দিকে টান পড়ে তেমনি টেথিস সমুদ্রের দুপাশ থেকে দুটি স্থলভাগ (দক্ষিণে ভারতের **গণ্ডোয়ানা, ল্যাণ্ড** ও উত্তরে রাশিয়ার **আঙ্গারাল্যাণ্ড**) টেথিসের দিকে এগোতে থাকে। সেই পার্শ্বচাপে টেথিস সমুদ্রের পলি কুঁচকে যেতে থাকে। এক টুকরো কাপড়কে দুপাশ থেকে চাপলে যেমন ভাঁজ পড়ে, এই পলিও অনেকটা সেইরকমভাবে কুঁচকে যায়। উপরন্তু টেথিসের সমুদ্রতল ফেটে যায় এবং সেখান থেকে নানান আগ্নেয়শিলা উপরের দিকে প্রবল বেগে ঠেলা মারতে থাকে। দুপাশ

থেকে এই চাপ এত প্রবল হয় যে টেথিস সমুদ্র সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় এবং সে জায়গায় দেখা দেয় পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী, হিমালয়। হিমালয় এখনও উঠছে। সেইজন্য প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।

আগেই বলেছি, পশ্চিমবঙ্গের বাকি অধিকাংশ অঞ্চল আধুনিক যুগে অর্থাৎ মাত্র ১০ লক্ষ বছরে পলি জমে সৃষ্টি হয়েছে। এই পাললিক সমভূমির মধ্যে সর্বপ্রথমে রাঢ়, ক্রমে বরেন্দ্রভূম, রাঢ় সংলগ্ন বদ্বীপ, ডুয়ার্স, তাল এবং সবশেষে দক্ষিণের সমতলটির সৃষ্টি হয়। এই গঠনকার্য এখনও চলছে। বিশেষতঃ হুগলীর মোহনায় এখনও বদ্বীপ তৈরি হচ্ছে।

ডুয়ার্স

১৮৬৫ সালে কালিম্পং মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি পশ্চিম ডুয়ার্স ভুটান রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বঙ্গদেশের মানচিত্রে স্থান পায়। ডুয়ার্স শব্দের অর্থ ভুটানের দরজা বা প্রবেশপথ। পর্বতময় ভুটান খুব দুর্গম এলাকা। জলপাইগুড়ির সমভূমি থেকে এই অরণ্যসংকুল দুর্গম পর্বতে যাতায়াতের মোট ৫টি প্রবেশপথ আছে। পশ্চিম থেকে পূর্বে এগুলি হল চামুর্চি, লখিমপুর, বাল্লা, বক্সা ও কুমারগ্রাম। এর মধ্যে একমাত্র ডুয়ার্স প্রকৃত পার্বত্য অংশে অবস্থিত।

দার্জিলিঙের খোলা

দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট উপনদী বা **খোলা** দেখা যায়। ১। উত্তর-পূর্বে দার্জিলিং-সিকিম সীমান্তে **রম্মান** নদীতে মিশেছে ১০টি খোলা : রথো, শিরি, পরথাম, গুরদুম, লোধোমা, রিথু, মংগং, দিল্লা, পালমঝুয়া এবং ঝেপি ঝোরা। এগুলি সিঙ্গালিলা শ্রেণীর পূর্ব ঢালে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে সরলবর্গীয় বনভূমি ও পরে মিশ্র বনভূমির মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে নেমে যায়। এই নদীখাত খুব ঢালু।

২। ঘুমের কাছে টংলুতে উৎপন্ন **ছোট রঙ্গীত** নদীতে মিশেছে ৪টি খোলা : সরজন, কালী, লারিং ও নেওরা ঝোরা। ছোট রঙ্গীত ও রম্মান নদী বড় রঙ্গীতের উপনদী। ছোট রঙ্গীতের ডানদিকের পাহাড় ঘন জঙ্গল ঢাকা, কিন্তু বাঁদিকের পাহাড়ে জঙ্গল সাফ করে চা-বাগান হয়েছে ; ধাপ চাষ করে স্থায়ী জনবসতি হয়েছে। এর কারণ, বাঁদিকে পাহাড় সারাদিন রোদ পায়, কিন্তু ডানদিকের পাহাড় বিকেলে সামান্য পড়ন্ত রোদ পায়।

৩। দার্জিলিং-সিকিমের সীমানা অনুসরণকারী **বড় রঙ্গীত**-এর আরও ৩টি খোলার উল্লেখ করা যায় : ঝেপি, রঙ্গনু ও লোপচু। এই খোলাগুলি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। এগুলির দুই পাশে অনেক চা বাগান হয়েছে। বড় রঙ্গীত তিস্তার উপনদী।

৪। **তিস্তা**-র অসংখ্য উপনদী। দার্জিলিঙে তিস্তার বর্ষণপুষ্ট খোলা-গুলির মধ্যে ১৪টির নাম করা যায় : পেশক, গিয়েল, কালী (বাম দিকের), রঙ্গিও, রায়েঙ, দাম (ডান), কালী, সিতি, রিল্লী, রঙ্গপো চু, টুমটাঙ, টর চু, ভলু, এবং সেবক। এই উপনদীগুলির খাত খুব গভীর।

৫। দক্ষিণ-পূর্বগামী **মহানদী**-তে ডানদিক থেকে ২টি এবং বাঁদিকে ৫টি খোলা এসে মিশেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিব, বাবুল, মান, ঝোটি, যোগী, গুল্‌ম, ঘোরামারা এবং সিংহী ঝোরা।

৬। **বালাসনও** মহানদীর উপনদী। বালাসনের উপনদীর মধ্যে ১৫টি খোলা উল্লেখযোগ্য : পুলুঙডাং, বঙ্গবঙ, মর্ম, মনজ্বয়া ঝোরা, দুধিয়া ঝোরা, চেঙ্গা মন্‌ঝ, ভীম, রঙ্গমুক্‌, জোর, পচ্ছিম, বিঞ্চিংটঙ, রুংস্নুং, রক্‌টি এবং রোহিনি।

৭। **মেচি** নদীতে দার্জিলিং পাহাড় থেকে যে সমস্ত খোলা এসে মিশেছে তার মধ্যে ৩টি উল্লেখযোগ্য : কিয়াং, আশী ঝোরা এবং মন ঝোরা। এই নদীগুলি দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে।

৮। কালিম্পঙে বক্সপো চু'র উপনদীগুলির ৪টি খোলা উল্লেখযোগ্য : ঋষি নালা, সীমানা, কাঞ্চেন খোলা ও মেনডঙ চু। এগুলি উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

৯। তিস্তার অপর প্রধান উপনদী রিল্লীর আবার বহু উপনদী আছে। সেগুলির মধ্যে ৯টি উল্লেখযোগ্য : ঠম্‌ক চু, কামেসি ঝোরা, পাল, রাণী, সুরুক, সমথার, গুলিং, পৌনবু এবং পর্বু। এগুলি উত্তর-থেকে দক্ষিণে বা পশ্চিম থেকে পূর্বে বা দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়।

১০। জলঢাকার অধিকাংশ উপনদীই সিকিম ও ভূটান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দার্জিলিং পাহাড়ে উৎপন্ন খোলাগুলির মধ্যে ৬টি উল্লেখযোগ্য : নী চু, পরেন খোলা, ঝালুং খোলা, নকসাল মূর্তি এবং নেওরা।

১১। **নী চু, মূর্তি ও নেওরা** নালারও অসংখ্য নামগোত্রহীন উপনদী আছে। এগুলি গভীর খাতের মধ্য দিয়ে খরবেগে প্রবাহিত হয়।

১২। লাভা গিরিদ্বারের উত্তর ঢালে যে খোলাগুলি দেখা যায় তার মধ্যে ৬টি উল্লেখযোগ্য : সীমানা, রচে, রংবং ও ঋষি এবং মানড়ুম।

১৩। পেডং-কালিম্পং শিরা একটি উল্লেখযোগ্য জলবিভাজিকা। এখান থেকে যে খোলাগুলি উৎপন্ন হয়েছে তার মধ্যে ৫টি উল্লেখযোগ্য : কাঞ্চেম, টুমটাং, টর চু, মাম ও বাবু।

১৪। লাভা গিরিদ্বারের চারদিকে চাকার মত ঘিরে নদী নেমেছে। দক্ষিণগামী **চেল** নদীর খোলাগুলির মধ্যে ৯টি উল্লেখযোগ্য : শির, শেল মঝুয়া, চুঙ্গ, চিটুং, অম্ব্যক, কালি, সুকনা ও মঙজিং।

১৫। লাভা থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত অপর নদীগুলির মধ্যে গিট বা গিশ এবং লিশ নালা উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির ৪টি উল্লেখযোগ্য খোলা : লেঠি, রামঠি, চুরনঠি ও হবং নালা এবং লিশ-এর মাত্র ১টি খোলা :

টুরাং। লিশ ও গিশ জলপাইগুড়ি জেলায় তিস্তার সঙ্গে মেশে। বর্ষায় এগুলি ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে কিন্তু অন্যান্য সময় প্রায় শুকিয়ে আসে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ১০০ টি খোলা আছে। এগুলির অধিকাংশই **জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযুক্ত** এবং সে কারণে উল্লেখযোগ্য। বড় নদীগুলিও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। জলঢাকা থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। তিস্তা বহুমুখী প্রকল্প রূপায়িত হলে বন্যা থেকে নিষ্কৃতি ও জলবিদ্যুৎ উত্তরবঙ্গের দুঃখ দূর করবে।

দার্জিলিং জেলার মধ্যে প্রধান নদীগুলির দৈর্ঘ্য কিলোমিটারে দেওয়া হল :

বালাসন	৪৮.৪০	লিশ নালা	১২.১০	রঙ্গনু খোলা	১৬.২৭
চেল নালা	১০.৪৬	মহানদী	৪০ ২০	বঙ্গপো চু	৯ ৬৬
চেঙ্গা নালা	৪৩.১০	মেচি	৩৬.২১	রায়েঙ নালা	১৮.৭০
ছোট রঙ্গীত	২৩.৭৭	মূর্তিনালা	১৩৮২	রিল্লী নালা	৩০.৬৪
গিশ (গিট) নালা	৩০.২০	নেওরা নালা	২৭.৪৬	ঋষি চু	১৭.৩৬
বড় রঙ্গীত	১৮৫৭	নী চু	১৪ ৯০	তিস্তা	৩৭.০০
জলঢাকা (দি চু)	১৯.৪৭	রম্মান	৩৯.৭৮		

জোয়ার ভাটা

চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণের ফলে সমুদ্রে ও খাঁড়িতে যে জলস্ফীতি হয় তাকে জোয়ার বলে। চিত্রে দেখ জো₂ তে চাঁদের আকর্ষণে জলভাগ (কালো

অংশ) স্থলভাগের চেয়ে বেশি আকর্ষিত হয়েছে, কারণ জলভাগ চাঁদের অধিক নিকটবর্তী। ফলে জো$_২$ তে জলস্ফীতি হয়ে জোয়ার হচ্ছে।

জো$_১$-এ স্থলভাগ (চাঁদের কাছে হওয়ায়) বেশি আকর্ষিত হয়েছে। ফলে স্থলভাগ ও জলভাগের মধ্যে কিছুটা শূন্যগর্ভ স্থানে জল জমে উঠে জোয়ার হচ্ছে। জ$_১$ এর জোয়ারকে গৌণ জোয়ার বলে।

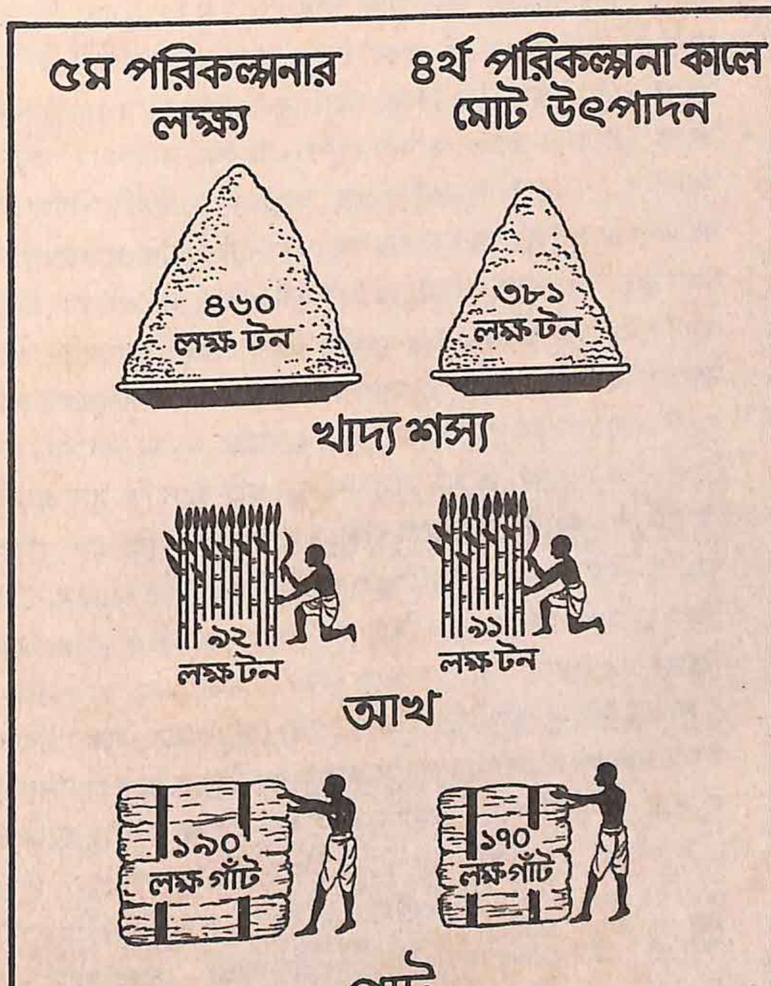
ভা$_১$ ও ভা$_২$ তে ভাটা হয়। কারণ, ঐ ছুটি অংশ থেকে জল জো$_১$ ও জো$_২$ এর দিকে যায়।



পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সর্বত্র দিনে ছুবার জোয়ার ও ছুবার ভাটা হয়। চাঁদ নিজের কক্ষপথে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীও ঐ একই দিকে আবর্তন করছে। কোনও স্থানে জোয়ার ভাটার পুনরাবৃত্তি হতে এক চান্দ্র দিন বা ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট সময় লাগে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য

পঞ্চম পরিকল্পনা এতদিনে শুরু হয়ে যাওয়ার কথা ; কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। ১৯৭৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আবার একটা প্ল্যান হলিডে শুরু হয়েছে।


৫ম পরিকল্পনার লক্ষ্য
৪র্থ পরিকল্পনা কালে মোট উৎপাদন
৪৬০ লক্ষ টন
৩৮১ লক্ষ টন
খাদ্য শস্য
৯২ লক্ষ টন
৯১ লক্ষ টন
আখ
১৯০ লক্ষ গাঁট
১৭০ লক্ষ গাঁট
পাট

স্থির হয়েছে, পঞ্চম পরিকল্পনায় শিল্পকে উপেক্ষা করা হবে না কিন্তু গ্রাম ও কৃষির উন্নয়নের উপর বেশি জোর দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলা হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের মাধ্যমে। তাতে অনেক বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে। বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের জন্য যখন আধুনিক হাতিয়ার অর্থাৎ বড় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র পাবার সম্ভাবনা কম তখন দ্রুত বেশি বেশি লোককে কাজে লাগানোর জন্য সহজ হাতিয়ারের (যা কুটির শিল্পে বা ছোট কারখানায় লাগে) সাহায্য নিতেই হবে। কুটির শিল্পে সহজ হাতিয়ার দিয়ে উৎপাদনের দক্ষতা আমাদের দেশে অনেক দিনের। পশ্চিমবঙ্গের চাষী অবসর সময়ে তাঁতের কাপড়, বাঁশ, বেত ও কাঠের নানান ধরনের দ্রব্য তৈরি করে। ঐসব শিল্পের কাঁচামাল এবং কৃষি যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি কেনবার জন্য কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সবুজ বিপ্লবকে সেজন্য ত্বরান্বিত করতে হবে। ক্ষুদ্রশিল্পের আধুনিকীকরণ করতে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে হবে। চাষীকে কম সুদে ঋণ দিতে হবে। সেচ বাড়াতে হবে। সার ও বীজ যোগাতে হবে ঠিক সময়ে এবং কম দামে।

পুরনো শিল্পের পুনর্জীবন ছাড়াও পেট্রো কেমিকালস, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি নতুন শিল্পোদ্যোগ শুরু করতে হবে। হলদিয়াতে তৈল শোধনাগার ও সার কারখানা করবেন কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকার যন্ত্রনির্ভর শিল্পের বদলে শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন। ঐসব শিল্পকে কলকাতা শিল্পাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত না করে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হবে। কলকাতার সমস্যা জাতীয় সমস্যা ; সেজন্য কলকাতার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার একযোগে ব্রতী হবেন। পাতাল রেলপথ ও হুগলীর উপর দ্বিতীয় সেতু, লবণ হ্রদ এলাকার

উন্নয়ন, কলকাতা ও হাওড়ার বস্তি উন্নয়ন ইত্যাদি পঞ্চম পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য।

স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ

এখানে শুধু পশ্চিমবঙ্গের গর্ব করার মত কয়েকটি স্বদেশী শিল্পের উল্লেখ করা হল।

রাসায়নিক শিল্প : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিকাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৭ সালে ভারতের অর্ধেক সালফিউরিক অ্যাসিড পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হত। ১৯২২ সালে পানিহাটি কারখানায় ভেষজ ও ওষুধ, ভারী রাসায়নিক এবং আলকাতরা থেকে নানা ধরনের দ্রব্য উৎপাদন শুরু হয়।

১৯১৬ সালে ক্যালকাটা কেমিকাল নিম থেকে রকমারি প্রসাধন, সাবান ও ওষুধ তৈরি শুরু করে। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল ইমিউনিটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এটি দেশের বৃহত্তম টীকা ও সিরাম উৎপাদনকারী সংস্থায় পরিণত হয়। ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হয় স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস এবং ১৯৩৬ সালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস। এগুলি প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ বিজ্ঞান অবলম্বন করে নানান ধরনের ওষুধ তৈরি করছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে রাসায়নিক শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল।

পাট শিল্প : স্বদেশী আন্দোলনের আগেই পাট শিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। ঐ আন্দোলনের ফলে এই শিল্পের কোনও বিকাশ হয়নি। কিন্তু স্বদেশী চটকলগুলি বিদেশীদের একাধিপত্য করতে দেয়নি। প্রথম স্বদেশী চটকল ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বিড়লা জুট মিল।

চর্ম শিল্প : বাংলার প্রথম ক্রোম ট্যানিং শিল্প স্বদেশী আন্দোলনেরই

অবদান। স্যর নীলরতন সরকার ১৯০৫ সালে এটি স্থাপন করেন। এখানে জুতোর ওপরকার চামড়া তৈরি হত। ১৯৪০ সালে কলকাতার আশেপাশে ১০০ টিরও বেশি ট্যানারি ছিল। এর কয়েকটি চীনারা চালায়।

দেশলাই শিল্প : ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে ভারতের মধ্যে বাংলাতেই প্রথম দেশলাই তৈরি শুরু হয়। ১৯০৭ সালে রাসবিহারী ঘোষ বন্দেমাতরম ম্যাচ ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন।

এনামেল শিল্প : ১৯১৮ সালে স্যুর এনামেল ওয়ার্কস এবং ১৯২১ সালে বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস কলকাতায় স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের ৯০% এরও বেশি এনামেল দ্রব্য পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হত।

চীনেমাটির বাসন শিল্প : ১৯০১ সালে রাজমহলের কাছে মঙ্গলহাটে চীনেমাটি পাওয়ার পর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও হেমেন্দ্রনাথ সেন ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস স্থাপন করেন। ১৯১৯ সালে এর নাম হয় বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেড। প্রথম ২০ বছরে বহু লোকসান সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠাতাদের অদম্য উৎসাহের ফলে এই সংস্থা আজ দেশের বৃহত্তম মৃৎশিল্পের কারখানায় পরিণত হয়েছে।

খাদ্যশিল্প : পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ চালকলই স্বদেশী উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে এ রাজ্যে ৪৫০টি চালকল ও ১৫টি ময়দাকল ছিল। ময়দাকলগুলি ছিল বিদেশীদের হাতে। ৩০টি তেলকলের অধিকাংশই স্বদেশী মালিকানায় চলত। ১৯১১ সাল থেকে স্বদেশী বিস্কুট ও বার্লি বাজারে আসতে থাকে।

মেশিনটুল শিল্প : ১৯৩০ সালে কলকাতার পি এন দত্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ প্রথম উঁচু মানের স্বদেশী মেশিন টুল তৈরি করে। ১৯৩৭ সালে আলামোহন দাসের ইণ্ডিয়া মেশিনারি কোম্পানি স্থাপিত হয়।

বিজলী বাতি শিল্প : ১৯৩২ সালে স্বদেশী মূলধনে তিনটি বিজলী

বাতির কারখানা স্থাপিত হয়—এর মধ্যে বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস খুব খ্যাতি অর্জন করে।

অন্যান্য শিল্প : ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে স্বদেশী উদ্যোগে অন্যান্য যেসব শিল্পসংস্থা গড়ে ওঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাচ, পাখা, সেলাইকল, সাইকেল, ট্রান্সফর্মার, ছাপাখানা, ডি গুপ্তর কুইনিন ও এফ. এন গুপ্তর পেন্সিল, ইকমিক কুকার, প্লাইউড ও কার্ডবোর্ড, কেশ তৈল, কালি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান

১। (ক) শূন্যস্থান পূরণ কর: বঙ্গদেশ এক নদীমাতৃক—যার এক অংশ পৃথিবীর বৃহত্তম— ; এর—পৃথিবীর—পর্বত, দক্ষিণে—উপসাগর, পূর্বে সবচেয়ে—পাহাড় ও — ভারতের সবচেয়ে— মালভূমি।

(খ) দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ হারায় বাঙলার — —, পূর্ববঙ্গ হারায় বাঙলার — —।

২। একটি স্বচ্ছ কাগজে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র ট্রেস বা অঙ্কন করে তাতে (ক) পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে দেখাও, (খ) প্রতিবেশী অঙ্গরাজ্যগুলিকে দেখাও, (গ) পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির সীমানা অঙ্কন কর, (ঘ) কর্কট ক্রান্তি রেখা নির্দিষ্ট কর।

৩। স্বাধীনতা লাভের পরে কোন কোন এলাকা পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি করেছে? পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির নাম কর। পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি গ্রাম ও শহর আছে?

৪। প্রাকৃতিক ও প্রশাসনিক সীমানার মধ্যে পার্থক্য কী?

৫। 'পূর্ব ভারতের হৃৎপিণ্ড' আখ্যাটিকে (ক) ভারতের নিরাপত্তা, (খ) পূর্ব-ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং (গ) কলকাতা বন্দরের ও শিল্পাঞ্চলের গুরুত্ব আলোচনা করে বিচার কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল পরিচয়

১। 'পরিবেশ' বলতে আমরা কি বুঝি? জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশ বর্ণনা কর।

২। জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চল অনুন্নত কেন? এখানে পরিবেশ ও জীবনধারার রূপান্তর কি ভাবে এবং কতটা হয়েছে?

৩। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলকে কোন কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ঘিরে আছে?

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর: (ক) সিঙ্গালিলা পর্বত শিরার কিছুটা — রাজ্য ও দার্জিলিঙের মধ্যে — ও বড় — নদী—ও দার্জিলিঙের মধ্যে এবং — নদী ভুটান ও দার্জিলিঙের প্রাকৃতিক সীমা নির্দেশ করছে। (খ) সিঙ্গালিলা শ্রেণী — ও — মহকুমাকে এবং — শ্রেণী — মহকুমাকে জড়িয়ে আছে। এই দুই পর্বতশ্রেণীর শাখাপ্রশাখাগুলিকে — বলে। নালা বা উপনদীকে — বলে।

৫। দার্জিলিঙের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে তাতে (ক) নীল কালিতে ৮টি প্রধান নদী, (খ) লাল কালিতে প্রধান সড়ক ও রেলপথ এবং (গ) ফালুত, সান্দাকফু, সিমানা বস্তি, মিরিক, কার্শিয়ং, সোনাদা, ঘুম, সেঞ্চল, সেবক, পেশক, সিঙ্গলা, রঙ্গপো, দার্জিলিং সদর, কালিম্পং, ঋষি লা, লাভা, ডালিং ও গরুবাথান এর অবস্থান নির্দেশ কর।

৬। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের জলহাওয়া বর্ণনা কর।

৭। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের (ক) পশুপক্ষী, উদ্ভিদ, (খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা ও (গ) জনবসতির সঙ্গে প্রকৃতিক পরিবেশের সম্বন্ধ আলোচনা কর।

৮। পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে তাতে (ক) চারটি প্রধান নদী, (খ) চারটি ডুংরী, (গ) কয়লাখনি অঞ্চল (ঘ) প্রধান রেলপথ, জাতীয় সড়ক এবং (ঙ) কংসাবতী জলাধার, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার অবস্থান নির্দেশ কর।

৯। মালভূমি অঞ্চলের জনবসতি ও জীবনধারার বৈশিষ্ট্য কী?

১০। 'Subsistence' শব্দটিকে ব্যাখ্যা কর। 'Gully' কথার অর্থ কী?

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর: (ক) পলাশ গাছে — —, তুঁত গাছে — — পালন করা হয় (খ) দামোদর উপত্যকা ছাড়া — পাহাড়েও কয়লা আছে, (গ) ৩২ নং জাতীয় সড়ক — থেকে — ও — পর্যন্ত বিভিন্ন — ও

শিল্পাঞ্চলকে যুক্ত করেছে, (ঘ) জেলা সদর ছাড়া এখানে (মালভূমি সংলগ্ন অঞ্চলে) ৭টি উল্লেখযোগ্য শহর আছে — —, —, —, —, —, —, ও— ।

১২। দামোদর উপত্যকায় কোথায় কোথায় কী কী শিল্প দ্রব্য তৈরি হচ্ছে ?

১৩। উত্তরের সমভূমি অঞ্চলকে কী কী উপবিভাগে ভাগ করা যায় ? তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৪। উত্তরবঙ্গের বন্যা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৫। উত্তরবঙ্গের মাটির সঙ্গে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের ও পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের মাটির তুলনা কর।

১৬। শূন্যস্থান পূরণ কর : (ক) দুই শতাব্দী আগে তিস্তার জল—ও—দিয়ে বইত, (খ) বরফপুষ্ট—ভুটানে আমো ও কোচবিহারে— বলে, (গ) তাল মানেই —, (ঘ) তরাই শব্দের মানে —, (ঙ) শুকনো পশ্চিমা বায়ুকে মালদাতে — বলে, (চ) ——, —— ও —— অভয়ারণ্যের বন্য প্রাণী পর্যটকদের একটা বিশেষ আকর্ষণ।

১৭। পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থায় শিলিগুড়ির গুরুত্ব নির্ণয় কর।

১৮। উত্তরবঙ্গের জীবন ধারার মূল বৈশিষ্ট্য কী ? প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এখানকার জীবন ধারার সম্পর্ক আলোচনা কর।

১৯। দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলের অবস্থান মানচিত্রে অঙ্কন করে দেখাও। কোন কোন জেলা এই সমভূমির অন্তর্গত ?

২০। মহারাজা ভগীরথের সঙ্গে উইলকক্স সাহেবের সম্বন্ধ কী ?

২১। নিচে কতকগুলি বাক্য দেওয়া আছে। এদের মধ্যে ভৌগোলিক তথ্যের বিচারে কোনগুলি ঠিক এবং কোনগুলি ভুল তা বার কর :
(ক) এখন গঙ্গা থেকে ভাগীরথীতে যত জল আসে তার চেয়ে অনেক বেশি আসে পশ্চিমের অজয়, দামোদর প্রভৃতি উপনদীগুলি থেকে। (খ) সুবর্ণরেখা ওড়িশা থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে আবার ওড়িশায় চলে গেছে

(গ) মুমূর্ষু বদ্বীপের নদীগুলি অপেক্ষা পরিণত বদ্বীপের নদীগুলি বেশি প্রাণবন্ত।

২২। ভাগীরথী বক্ষে কেন চড়া পড়ে? মুর্শিদাবাদে কালান্তর বিল কিভাবে তৈরি হয়েছে?

২৩। কোন কোন নদীর খাত এখন দামোদরের সেচখাল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে? এই নদীগুলি সম্বন্ধে কী জান?

২৪। ময়ূরাক্ষী ও দামোদরের গতিপথ বর্ণনা কর। হানা কাকে বলে?

২৫। দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে কী কী কারণে বন্যা হয়? উত্তরবঙ্গের বন্যার সঙ্গে এর প্রভেদ কী?

২৬। দক্ষিণবঙ্গের সমভূমির মাটির সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২৭। দক্ষিণবঙ্গের সমভূমির যাতায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২৮। শূন্যস্থান পূরণ কর : (ক) — নদীর উপর তাম্রলিপ্ত এবং — নদীর উপর সপ্তগ্রাম একসময়ে বিখ্যাত — ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল (খ) দক্ষিণবঙ্গের গ্রামীণ জনসমষ্টিকে চার ভাগে ভাগ করা যায় —, —, — ও —। (গ) দক্ষিণবঙ্গে তেলের সন্ধান করতে গিয়ে — ও — সন্ধান পাওয়া গেছে।

২৯। দক্ষিণবঙ্গের সমভূমির গ্রামাঞ্চলের জীবনধারা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩০। টীকা লেখ : মুমূর্ষু বদ্বীপ, পরিণত বদ্বীপ, ডুয়ার্স অরণ্যভূমি, ল্যাটেরাইট, হানা, ভৌমজল, বাঘা মেটেল, দোসেতা, বিন্ধ্য পাললিক, হিজল বিল, বাঁওড়, আড়ুলি, টুঙ, দামোদরের নিম্ন উপত্যকা অঞ্চল, ময়ূরাক্ষী জলাধার,

৩১। দক্ষিণবঙ্গে কোথায় কোথায় কী কী কুটির শিল্প আছে?

৩২। দক্ষিণবঙ্গের শহরাঞ্চলের জীবনধারা বর্ণনা কর।

৩৩। কলকাতা শিল্পাঞ্চলের প্রধান প্রধান শিল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩৪। তরাই বনভূমির সঙ্গে সুন্দরবনের তুলনা কর।

৩৫। নিচে কতকগুলি বস্তুর নাম দেওয়া আছে। এগুলির মধ্যে কোনগুলি বনজ, কোনগুলি কৃষিজ এবং কোনগুলি প্রাণিজ তা নির্ণয় কর এবং পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলে পাওয়া যায় তা নির্দেশ কর ঃ আখ, মধু, কুইনিন, তামা, ইলিশ, চুনাপাথর, অভ্র, চা, পাট, লাক্ষা, রেশম, পাইন, কয়লা, এক শিং গণ্ডার, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সুন্দরী গাছ, খস, শোলা।

৩৬। পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে তাতে (ক) বেগনী রঙে দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চল, (খ) নীল রঙে বক্সা-জয়ন্তী পাহাড় (গ) সবুজ রঙে উত্তরবঙ্গের সমভূমি, (ঘ) হলদে রঙে পশ্চিমের মালভূমি, (ঙ) লাল রঙে দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি এবং কালো রঙে সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের বালিয়াড়ি উপকূল চিহ্নিত কর।

৩৭। সুন্দরবনের জলবায়ুর সঙ্গে বাড়িঘর তৈরির সম্পর্ক কী?

৩৮। সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কী জান?

৩৯। সুন্দরবনের জীবনধারার সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক আলোচনা কর।

৪০। মেদিনীপুর বালিয়াড়ি উপকূলের আঞ্চলিক বিবরণ দাও।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন পরিকল্পনা

১। 'মানুষের মঙ্গলই দেশোন্নয়নের চরম লক্ষ্য'—কথাটিকে ব্যাখ্যা কর।

২। পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কাকে বলে?

৩। টীকা লেখ ঃ ব্যক্তিগত সম্পদ, সামাজিক সম্পদ, সরকারী পরিকল্পনা নীতি, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা, জাতীয় আয়, সমাজতান্ত্রিক দেশ, মিশ্র অর্থব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকল্পনা।

৪। 'দেশের অর্থনীতি ক্রমাগত চাকার মত ঘুরে চলেছে'—কথাটিকে ব্যাখ্যা কর।

৫। 'বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন যত বাড়ে তত সম্পদ বাড়ে এবং উন্নয়ন হয়'—কথাটিকে ব্যাখ্যা কর।

৬। বহুমুখী নদী প্রকল্প বলতে কি বোঝ ?

৭। উৎপাদনের উপকরণ থাকলেই উৎপাদন হয় না কেন ?

৮। রোজগারের দিক থেকে শ্রম+ধন=পণ্য আর মজুরি+মুনাফা=সমাজের আয় ; অথবা ব্যয়ের দিক থেকে ভোজ্য দ্রব্য+ধন দ্রব্য=মোট পণ্য=সমাজের আয়। উপরের হিসাবটিকে ব্যাখ্যা কর।

৯। উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের উৎপাদিকা শক্তির ঘুম ভাঙাতে হয়। কী কী পদ্ধতিতে এই ঘুম ভাঙানো যায় ?

১০। পরিকল্পনার জন্য অর্থ কিভাবে সংগৃহীত হয় ?

১১। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য কিভাবে অর্থ সংগৃহীত হয় ?

১২। পরিকল্পনার বাজেট বলতে কি বোঝ ?

১৩। পরাধীনতা দেশের উন্নয়নে কিভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল ?

১৪। বিদেশী শক্তির শাসন ও শোষণে বঙ্গদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন ?

১৫। শূন্য স্থান পূরণ কর :

(ক) অতীত গোণার জন্য—, ভবিষ্যৎ গোণার জন্য—। (খ) শিল্প-কুশলতা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনের—কমে কিন্তু সম্পদের—ও—বাড়ে, আয় বাড়লে—বাড়ে, মুনাফা বাড়লে—বাড়ে। (গ) সুভাষ ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার—, জওহরলাল—।

১৬। দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছিল ?

১৭। পশ্চিমবঙ্গের জনসমস্যা ও খাদ্য সমস্যার সম্পর্ক আলোচনা কর।

১৮। বিভিন্ন পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে কত অর্থ ব্যয় হয়েছে ?

১৯। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক কী ?

২০। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চল সেচ ব্যবস্থার জন্য উপকৃত হয়েছে ? কী কী পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয়েছে ?

২১। জলনিকাশের সঙ্গে কৃষি উন্নয়নের সম্পর্ক কী ?

২২। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে জলনিকাশ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়েছে?

২৩। স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার যে উন্নতি হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

২৪। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও জেলা সড়কের তফাৎ কী? পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কয়টি জাতীয় সড়ক আছে? এগুলি কোথা থেকে কতদূর অবধি বিস্তৃত?

২৫। দক্ষিণবঙ্গের সমভূমির সমৃদ্ধিতে কলকাতা বন্দরের পশ্চাদভূমির অবদান কী?

২৬। স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে? এইসব অঞ্চলে কী কী পণ্য উৎপাদন হচ্ছে?

২৭। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসারে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছে? এই সব সমস্যা সমাধানের উপায় কী?

২৮। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২৯। পরিকল্পনা কালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে?

৩০। পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি হয়েছে?

৩১। পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩২। প্রথম চারটি পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কি জান?

৩৩। ভারতের বহির্বাণিজ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩৪। **Plan Holiday** বলতে কী বোঝ?

৩৫। ভারতের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

Desh O Manush 2

Rs 3·30

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট, কলিকাতা ৬